# কিশোর ও কৈশোর

নির্মল চৌধুরী

শিশু লালনী গ্রন্থমালা

বাবা-মা'রা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাঁদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মা'দের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সরল-মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুপালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত ক'রে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত ক'রে তাঁদের সমাদর করবেন।

*সম্পাদক—*

শিশুলালনী গ্রন্থমালা : চতুর্থ পুস্তিকা

# কিশোর ও কৈশোর



নির্মল চৌধুরী, এম, এ

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
হাওড়া

# প্রারম্ভিক

বাবা-মার দিক থেকে শিশুকে মানুষ ক'রে তোলার কাজ প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই, আর সন্তানের কল্যাণাকাঙ্খা চলতে থাকে তাঁদের সারা জীবন ধ'রেই। কল্যাণ ও স্নেহ-ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশ কিন্তু সন্তানের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ-কথাটা ভুলে থাকার জন্যে প্রায়ই উঠ্‌তি বয়সের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দেখা দেয় নানান সমস্যা। মা-বাবারা যাতে শিশুর ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর, অথচ অবহেলিত সেই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে, শিশুকে শৈশব থেকে কৈশোরে ও কৈশোর থেকে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে পারেন, তারই সহায়তা কল্পে এই সামান্য পুস্তিকাখানি প্রকাশ করা গেল। কিশোর-পরিচালনায়, কিশোর-পরিচালক ও শিক্ষকরাও যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হন, প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনাও পুস্তিকাখানিতে কিছু কিছু ক'রেছি। তাই আশা করি, কিশোর-কল্যাণকামী মাত্রের কাছেই পুস্তিকাখানি সমাদৃত হবে।

'লেখক'

## কৈশোর বলতে কি বুঝি

সব ছেলে-মেয়ের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন তাকে ঠিক শিশুও বলা চলে না আবার বয়স্ক মানুষ বলে মনে করলেও তার সম্বন্ধে একটা অতিরিক্ত ধারণা করা হয়ে যায়। আসলে, এই সময়টাতে দেহের ও মনের দিক দিয়ে ছেলে-মেয়েরা বয়স্ক মানুষের মতন হয়ে উঠতে থাকে। শৈশবের সীমানা ছাড়িয়ে ছেলে-মেয়েরা তো একদিনে আর বড় হয়ে ওঠে না, তাদের বয়স্ক মানুষ হতে সময় লাগে প্রায় আট বছর। এই সময়ের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা বারো থেকে কুড়িতে গিয়ে পা দেয়। বিলাতী কায়দায় যাকে আমরা 'টিন এজে'র অর্থাৎ 'বয়ঃসন্ধি'র কাল বলি আর যাকে মেয়েলি কথায় 'বয়সের ছেলে-মেয়ে' হবার কাল বলে মনে করি, কৈশোর হলো ঠিক সেই সময়।

## কৈশোরের প্রকৃতি

এই সময় শিশু নিজে ও তার কাছে তার আশে পাশের জগৎ এমন ভাবে বদলে যেতে থাকে যে, মনে হয়, সে যেন আবার নতুন করে আর এক জন্ম নিচ্ছে। শৈশবের বয়সগুলি কেটে গেছে তার নিজেকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আর এই প্রাকৃতিক জগৎটার সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই; এখন থেকে তাকে আবার নতুন করে মানিয়ে চলা শিখতে হয়—বৃহত্তর মানুষের সমাজের সঙ্গে, আর ন্যায়-অন্যায় ও ধর্মবোধযুক্ত জগতের সঙ্গে। এত দিন কেটে গেছে খেলা-ধুলো আর আদর-আব্দারের মধ্য দিয়ে; বাবা-মা যেমন বলেছেন তেমন সে করেছে। তাঁদের ওপর সে ছিল একান্ত নির্ভরশীল। যুক্তি, ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, ভালোবাসা, বিশেষ ধরণের আবেগানুভূতি বোধ—এসব তার মধ্যে তেমন ভালো করে, ছিল না মোটেই। কিন্তু এখন তার মনে জাগতে

থাকে একটু একটু করে আত্মনির্ভরশীলতার ভাব। দেখা দেয় স্বাধীনভাবে নতুন নতুন সৃষ্টিমূলক কাজ করার উদ্দীপনা আর উৎসাহ। সব কাজেই অভিভাবকের হস্তক্ষেপ তেমন আর পছন্দ হয় না তার। নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বড়দের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতেও পিছপাও হয় না সে। সবাই তাকে 'খোকা খোকা' মনে করুক এ-ভাবটা তার আর পছন্দ হয় না। নিজেকে বয়স্ক মানুষ বলে তার মনে হলেও বড়রা কিন্তু তাকে সে চোখে দেখতে চায় না, তাকে ছোট মনে করে ধম্‌কে-ধামকেই রাখতে চায়।

অন্যদিকে কম বয়সী ছেলেদের সঙ্গেও ভালো করে মিশতে পারে না সে। তাদের খেলাধূলো তার কাছে ছেলেমানুষী লাগে। অল্প বয়সীরাও তার সর্দারীতে অস্থির হয়ে পড়ে। তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। দৈহিক ও মানসিক এই পরিবর্তনের জন্য পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এই বয়সের ছেলে-মেয়ের পক্ষে মহা মুস্কিল হয়ে পড়ে, ফলে তাদের মনের মধ্যে বেশ একটা তোলপাড় চলতে থাকে। বড়রা, যাঁরা এ-বয়স পেরিয়ে এসেছেন, যাঁদের কাছে এই সময়ের স্মৃতি গেছে ক্ষীণ হয়ে, কৈশোরের প্রকৃতিটিকে তাঁরা সব সময় ঠিক সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন না। কিন্তু তবুও যদি কোনওদিন তাঁরা একবার অতীতের কথা ভেবে দেখেন তাহলে তাঁদের কাছে এই কথাই বিশেষ করে মনে হবে যে, "তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না। তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জেঠামি এবং কথামাত্রেই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়ে থাকিতে পারে

না। শৈশবের এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

"সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে।... .....চারিদিকে স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত: নারীজাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।" ('গল্পগুচ্ছ'—রবীন্দ্রনাথ)

ওপরের এই বর্ণনা থেকে কৈশোরের প্রকৃতি ও কিশোর মন কি চায়, তা আমরা বেশ খানিকটা ধারণা করতে পারি। কাজেই কৈশোর কালকে একটা তথাকথিত সাংঘাতিক ও 'ঝড়-ঝঞ্ঝার' কাল বলে মনে করার কিছু নেই। আসলে আমরা বড়রা, ছেলেমেয়েদের হঠাৎ বড় হতে দেখে নিজেরাই কেমন হয়ে যাই। তাদের সঙ্গে শিশু না বয়স্ক মানুষের মতন ব্যবহার করবো ঠিক করতে পারি না। ফলে, এইসময় বাড়ী বা বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তাদের মনে এক অপ্রীতিকর বিরূপ ধারণা এমন বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ফাঁকি দেওয়া, বাড়ী থেকে পালানো, এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সময় কিশোরের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ বদলাতে থাকে। নর-নারীর সম্বন্ধকে নতুন চোখে সে দেখতে শেখে। ধর্ম, ভাবপ্রবণতা ও নানা রকমে ভাবাবেগের প্রকাশই তার

বয়সের বৈশিষ্ট্যতা। বয়স্ক মানুষের জীবন সম্বন্ধে সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কৈশোরে কিশোর যে নতুন এক জগতে জন্ম নিচ্ছে, একথা কিন্তু সে নিজে ঠিক বুঝতে পারে না; এমন কি নিজেকেও সে চিনতে পারে না। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এই সময় কেবলমাত্র আকার নেয়। অহংভাব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ে আর নিজের সব কিছুকেই সে বাড়িয়ে দেখতে চায়। এই সময় যদি আমরা কৈশোরের পরিবর্তন-ধারার দিকটি মনে রাখি এবং ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই মত ব্যবহার করি তাহলে কৈশোরের অনেক সমস্যাকেই আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো। প্রথমে তাই আমাদের আলোচনা করা যাক সেই সব পরিবর্তনের দিকগুলি যা এই সময়ে বিশেষভাবে কিশোরের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

## দৈহিক বিকাশ

বাইরের দিক দিয়ে কৈশোরকে সহজে চেনা যায় তার দৈহিক পরিবর্তন দেখে।

কৈশোরের সুরু থেকেই ছেলেমেয়েরা হঠাৎ এমন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে থাকে যে, আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে যাই। মেয়েদের বেলায় তো বলেই বসি এ যেন 'কলাগাছের বাড়'। এই সময় দেহের ওজন, হাত, পা, চেটো প্রভৃতির গঠনও বাড়তে থাকে। শরীরের পেশী, হাড় ও অন্যান্য যন্ত্রগুলিও পুষ্ট ও পূর্ণ হতে থাকে। অনেক সময়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক বাড়ের জন্য, সাধারণের মাঝে ছেলেরা আত্মপ্রকাশ করতেই লজ্জা বোধ করে। নিজেকে এই বাড়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তার সময় ও অভ্যাসের দরকার হয়। এই সময় বিশেষ ভাবে তাদের গলার আওয়াজ বদলে যায়। শৈশবে ছেলে-মেয়েদের গলার স্বরের মধ্যে তেমন তফাৎ দেখা যায় না। তবে এখন থেকে ছেলেদের গলার স্বর কর্কশ বা শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। দাড়ি, গোঁপ ইত্যাদি কেশোদ্গম এই বয়সের একটা

বিশেষ ধর্ম। তাদের বুক, কাঁধ বেশ সুগঠিত ও চওড়া হয়। মোটের ওপর ছেলেদের মাঝে পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে।

মেয়েদের বেলায় দৈহিক পরিবর্তন একটু তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করা যায়। ছেলেদের দৈহিক পরিবর্তন যদি সুরু হয় ১১—১৬ বছরের মধ্যে, তবে মেয়েদের হয় ৯—১৪ বছরের মধ্যে। বলা যেতে পারে, ১২ বছর বয়সেই মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে মেয়েদের আগতপ্রায় যৌবনের চিহ্নগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, গাত্র বর্ণে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় ও বয়সোচিত অন্যান্য লক্ষণাদিও দেখা দেয়।

এই সব দৈহিক পরিবর্তন, সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে, একই সময়ে একই ভাবে দেখা যায় এমন নয়; কারুর মাঝে তাড়াতাড়ি দেখা দিতে পারে, কারুর মাঝে বা এর প্রকাশ দেরিতেও হতে পারে। শীতপ্রধান দেশে কৈশোরের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় দেরিতে আর ভারতবর্ষের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে এর প্রকাশ তাড়াতাড়িই দেখা যায়। সাধারণত মেয়েদের মাঝে ছেলেদের চেয়ে কয়েক বছর আগেই কৈশোরের আবির্ভাব হয়। ১৪ বছর বয়সের পর থেকে মেয়েদের বাড় অপেক্ষাকৃত কমতে থাকে এবং ২০ বছর বয়সেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেদের বেলাতে, ১৫।১৬ বছর বয়সের পর থেকে বাড় কমে গেলেও, ধীরে ধীরে তা ২২—২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।

## *দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা*

দৈহিক বিকাশ প্রকৃতিজাত এবং তা ঘটেই থাকে—এ-ধারণা বড়দের কাছে সহজ মনে হলেও, ছোটদের কাছে কিন্তু সব সময় এই

পরিবর্তন সহজ ভাবে দেখা দেয় না। শুধু দৈহিক পরিবর্তন উপলক্ষ্য করেই কিশোরদের কাছে এমন সমস্যা দেখা দেয় যে, তা অভিভাবকদের বেশ চিন্তিত করে তোলে। যে-সব ছেলে-মেয়ের বাড় বেশী, 'ধিঙ্গী' বা 'ধাড়ী' বলে প্রায়ই যদি তাদের বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তাতে ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, মুষড়ে পড়ে ও নিজেকে কাজের অযোগ্য বলে মনে করে। গোঁপ ওঠা, চোয়ালের হাড় চওড়া হওয়া, ব্রণ-ওঠা, ইত্যাদির ওপর তীব্র মন্তব্যতেও বয়সের ছেলেমেয়েরা এত মনমরা আর লজ্জিত বোধ করে যে, অনেক সময় তারা কারুর সাথে মিশতেই চায় না। একা-একা থাকতেই ভালোবাসে, হয়তো বা অল্পতেই খিট্ মিটে মেজাজের হয়েও উঠতে পারে। কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা ভাবে দেখতে মোটেই পছন্দ করে না। ফলে সে নিজের দৈহিক পরিবর্তনাদির সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে ও তার সম্বন্ধে সমালোচনা বা তুলনাদির কথা হলে, সে অত্যন্ত কাতর ও অপরাধীর মতন বোধ করে।

এই রকম দুঃখজনক মনোভাব যে সবক্ষেত্রেই দেখা যায় এমন নয়। বড় হয়ে ওঠার ইচ্ছে ও নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ওপরই সব কিছু নির্ভর করে।

দ্রুত দৈহিক বিকাশ যেমন ছেলেমেয়েদের কাছে সাময়িক ভাবে দুঃখদায়ী হয়, আবার বিলম্বিত বিকাশেও নিজেকে অন্যের চেয়ে ভিন্ন মনে করে তারা লজ্জিত বোধ করে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে বিকাশের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই সুফল পাওয়া যায়।

সোজা হয়ে বসা, হাঁটা, চলা ইত্যাদির মূল্য, শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সময় দ্রুত-বর্দ্ধমান ছেলে-মেয়েরা নিজেদেরকে ঠিক মতো চালিয়ে নিতে কিছুটা অসুবিধা বোধ

করতে পারে বা ক্লান্তি বশত অনেক সময় তারা কুঁজো হয়ে হাঁটা-বসা ক'রে বদ্ অভ্যাসটি পাকাপোক্ত করে নিতেও পারে। অনেক সময় বড় হওয়া সম্বন্ধে হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে ছেলে-মেয়েরা—বিশেষ ভাবে মেয়েরা কুঁজো হয়ে চলা ফেরা ক'রে থাকে। প্রথমোক্ত কারণটির জন্ম যথেষ্ট বিশ্রাম ও সাধারণ ধরণের ব্যায়ামাদি প্রয়োজন। শেষটির জন্য মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, সুন্দর, লম্বা-চওড়া শরীর সৌন্দর্যের একটা অঙ্গ; আর দেহের অসমবাড় সাময়িক মাত্র। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কুঁজো হওয়া স্বভাব একবার গেড়ে বসলে তা সহজে ছাড়ানো যায় না।

মায়েরা এ বিষয়ে মেয়েদের ঠিক মতো পোষাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন ক'রে দিয়ে, এ দোষ দূর করতে তাদের অনেকটা সাহায্য করতে পারেন। অন্যান্য ভাই-বোনেরা যাতে এই বাড়ন্ত ভাই-বোনেদের পিছনে কম লাগে ও কম টিট্‌কারী কেটে কথা বলে, সেদিকেও অভিভাবকদের লক্ষ্য দেওয়া দরকার। পরিবারের সকলেই যাতে অন্যকে কম আঘাত দিয়ে, বিবেচনার সঙ্গে হাসি তামাসা করে কথা বলে, তাতেই সবাইকে উৎসাহিত করা উচিত।

বয়ঃব্রণ, এই বয়সের একটা বৈশিষ্ট্য। এই সময় শরীরের ভিতর থেকে কিছু বেশী পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ বেরোয়। এই তৈলাক্ত পদার্থ ধুলো-ময়লার সাথে মিশে লোমকূপের মুখে কালো কালো উচু মতন হয়ে ওঠে। সাধারণ বীজাণুগুলি এখন এর তলায় আশ্রয় নেয় এবং চামড়ায় সামান্য ক্ষত করে, তার ফলে ব্রণাদি দেখা দেয়।

ছেলে-মেয়েরা এই সময় নিজের চেহারা সম্বন্ধে বেশ সচেতন থাকাতে, ব্রণের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলিকে আঙ্গুলে ক'রে গেলে দেয়। এতে আশেপাশের চামড়ায় বীজাণু ছড়িয়ে তো পড়েই; আঙ্গুলেও বীজাণু গুলি লেগে যায়। তাই অন্য জায়গায় হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নতুন ব্রণ দেখা দেয়।

ব্রণগুলি গালার ফলে প্রায়ই সেগুলি বড় ও গভীর হয়ে যায় আর মুখে দাগ থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

ব্রণকে দূরে রাখতে হলে, খোলা আলো-হাওয়ায় ব্যায়াম, খেলা-ধুলো, পুষ্টিকর আহার দরকার। দুইবেলা সাবান ও গরম জল দিয়ে গা মুখ পরিষ্কার রাখা দরকার। পেট যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত। আর এই সময় চকলেট্, লজেন্স, আর মশলাওয়ালা খাবার ইত্যাদিও বর্জন করা দরকার।

এই সময়কার প্রথম শারীরিক ধর্মাদি লক্ষ্য করে মেয়েরা এবং সিক্ত-স্বপ্নাদি হেতু ছেলেরা হয়তো অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়তে পারে, বা নিজেদের পাপী ব'লে মনে ক'রে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। এ-সব ক্ষেত্রে মায়েরা মেয়েদের, বাবারা ছেলেদের বিজ্ঞোচিত উপায়ে, যথাযথ ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে অন্তত এই বলে তাদের নিঃশঙ্কিত করতে পারেন যে, এটা বড় হবার পথে একটা ধাপ মাত্র। সে যদি যথাযথ কাজ, বিশ্রাম, স্নান ও আভ্যন্তরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখে; সুঅভ্যাস সদ্-বিষয়ের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে, তবে এতে চিন্তান্বিত হবার কিছুই নেই। যথাযথ জ্ঞান লাভ না করার ফলে, সময় সময় ছেলেরা বাইরে থেকে এমন সব শিক্ষা লাভ করে, যাতে তার মানসিক শারীরিক, দুই রকমের ক্ষতিই হয়ে থাকে।

## শ্রম ও বিশ্রাম

এই সময় প্রকৃতিতে যে অতিরিক্ত শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, তাতে কিশোর প্রাণ হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রমে মত্ত হয়েও কিছু ক্লান্তি বোধ না ক'রতে পারে, কিন্তু এটা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর; যাতে সে যথাযথ বিশ্রামাদি পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

## মানসিক বিকাশ

কৈশোরের প্রথম দিকটায় ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি-বৃত্তি বেশ খানিকটা

বাড়তে থাকে কিন্তু দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে বয়সের অনুপাতে সেটা খানিকটা কমে আসে। এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের খোঁজখবর রাখা, খবরের কাগজ পড়া, রাজনীতি বা ক্রীড়া জগতের কে-কি, সম্বন্ধে উৎসুক হওয়া ইত্যাদি দিক দিয়ে তাদের সাধারণ জ্ঞান বেশ বাড়তেই দেখা যায়। চিন্তাগ্রাহ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়-বস্তুগুলি গ্রহণ করবার ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়াও অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করা, আপন বুদ্ধিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগানো ইত্যাদি ক্ষমতাও কিশোরের মাঝে ভাল ভাবেই দেখা দেয়। বিশেষ বিষয়ের ওপর আকর্ষণ, যেমন—সঙ্গীত, শিল্প, নাটক, বিজ্ঞান, হাতে কলমে কাজ ইত্যাদির ওপর কৌতূহল বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে দেখা যায়। এই সময় বা এর কিছু আগে বা পরে, জীবন সম্বন্ধে তার কিছুটা পরিষ্কার জ্ঞান হয়। সংসারে তার স্থান কোথায় সেটাও বেশ তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের ন্যায়-নীতির ধারণাকেও কাজে লাগাতে চায়। এমনি ভাবে বুদ্ধি পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর মনটিও গড়ে উঠতে থাকে। অর্থাৎ—সংসারে অনেক কঠিনতর ও জটিলতর বুদ্ধি-সংক্রান্ত কাজগুলি সে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে থাকে। তার মনঃসংযোগ ও মুখস্থ-শক্তিও বাড়তে দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে-ছেলেকে শৈশবে নিচু ক্লাশে মাথা মোটা বলে মনে হতো, কৈশোরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পড়াশুনায় বেশ সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে এবং আর সব সাধারণ ছেলের পর্যায়ে আসতে দেখা যায়।

আগে যেমন দৈহিক দিক দিয়ে তার আত্ম-সচেতনার কথা বলা হয়েছে, এখন তেমনি মনের দিক থেকেও এবিষয়ে সে কতটা অভিভূত হয় দেখা যাক।

এই সময় ছেলেমেয়েরা আর কল্পনা-সর্বস্ব শিশু থাকে না।

নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মায়। অন্যের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়, এ সম্বন্ধে সে বেশ আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। নিজের কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার দ্বারা সে প্রভাবান্বিত হয়। অন্যেরা তার সম্বন্ধে কি বলে না বলে, এ সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। তরুণ হিসাবে তারা শিক্ষকের আদর্শের দ্বারা, নেতার আদর্শের দ্বারা, সাহিত্যের নায়ক ও মহৎ জীবনের আদর্শের দ্বারাও খানিকটা অভিভূত হয়। তার জীবন-দর্শন ও আদর্শও গড়ে উঠতে থাকে।

পূর্ণ-কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের ন্যায়-নীতির ধারণা প্রায় বড়দের ধারণার পর্যায়ে পৌঁছায়। এই ধর্মবোধ বিশেষ ভাবে আত্মিক বা বিবেক-বিচার বোধ-প্রসূত হয়ে থাকে। শৈশবে শিশু অন্যায় থেকে বিরত থাকে, কর্তৃত্ব, তাড়না, প্রহার ইত্যাদির ভয়ে। বড় হবার সাথে সে-ভয় তার কমে আসে, তখন বিবেকই তাকে অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে। এই বিবেক-বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ নির্ভর করে শৈশব, কৈশোর ও পারিপার্শ্বিকের শিক্ষার ওপর; কৈশোরের শেষ সময়, তার এই ধারণা শুধু বড়দের সমানই হয় না, কর্তব্য জ্ঞান ও অন্যান্য ধর্মবোধও জাগ্রত হয়। তবে এতদিন তারা যা বিনা দ্বিধায়, নিয়ম ও লোকাচার বলে মেনে এসেছে, তা তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগায়। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে একে বিচার করতে চায়। ফলে বড়দের ধারণা থেকে, তাদের ন্যায় অন্যায় বোধটা অন্য দৃষ্টিতে দেখা দেয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিশু যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, সেটাই প্রবল ভাবে কাজ করতে থাকে।

কৈশোরে প্রবৃত্তিসকল প্রবল থাকে বলেই যে তাদের ন্যায় অন্যায় বোধ কিছু কম থাকে এমন নয়। তারাও অন্যায় দেখলে বিচলিত হয়ে ওঠে। তবে বয়সের ছেলেমেয়েকে যে আমরা বিপথে যেতে দেখি, তার একটা কারণ এই যে, তার মাঝে বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা, বিচার-বুদ্ধি এই সব কম থাকে। এই জন্যই তাদের পক্ষে প্রয়োজন, বয়স্কদের সহানুভূতিপরায়ণ দৃষ্টি ও অভিজ্ঞ পরিচালনা।

## মানসিক বিকাশ ও লেখাপড়া

মানসিক বিকাশের সঙ্গে লেখা-পড়ার একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যেহেতু দৈহিক বিকাশের মতন এই মানসিক বিকাশ বাইরে থেকে লক্ষ্য করার উপায় নেই, সেই জন্য আমরা প্রায়ই করি কি, শিশু স্বল্প-বুদ্ধি হোক বা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হোক বা সাধারণ-বুদ্ধি সম্পন্ন হোক, সকলকেই আমরা একই ছাঁচে লেখা-পড়া শেখাতে চেষ্টা করি। আমরা শিশুর শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখতে চাইনা যে, সত্যিই সে কোন শিক্ষার উপযোগী, কোন্ পথে চালালে তার ভালো হবে? তার বিশেস শক্তি বা অক্ষমতা কি? ফলে হয় কি, শিশুর শক্তির অপচয় ত হয়ই, পিতামাতারও অর্থনাশ ও মনস্তাপের অন্ত থাকে না। কাজেই শিশুর বুদ্ধি সম্বন্ধে যদি আমরা খানিকটা ওয়াকিবহাল হতে পারি, তাহলে এই ব্যর্থতা থেকে কতক পরিমাণে মুক্ত থাকতে পারি।

বিগত কয়েক দশকে মনোবিদ্‌রা বুদ্ধি পরিমাপ করবার নানান উপায় আবিষ্কৃত করেছেন এবং এক্ষেত্রে অনেকটা সফলতাও অর্জন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে শিশুর প্রকৃত বয়স ও মানসিক বয়স এক হয় না। যেমন, কোন শিশুর বয়স হয়তো ১২ বছর, কিন্তু বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার মানসিক বয়স ১০ বছরের শিশুর সমান। তার মানে হলো, শিশুটি তার বয়সের তুলনায় দু'বছর পিছিয়ে আছে। কাজেই এখন যদি তাকে ১২ বছরের ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে চলতে হয়, তাহলে তার এক্ষেত্রে সফলতা লাভ না করার সম্ভাবনাই বেশী। অভিভাবকরা যদি শিশুর মানসিক শক্তি নিরূপণ করতে মনোবিদ্‌গণের সাহায্য নেন ও কিশোরকে পরিচালিত করেন তবে সত্যই তার ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণ হয়।

এ সব ক্ষেত্রে অভিভাবকের পক্ষে দরকার—(১) সহজভাবে

শিশুর নিহিত শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে, তার উন্নতির পথের অন্তরায়গুলিকে দূর করা।

(২) বিদ্যালয়ে শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী এমন শ্রেণীতে ভর্তি করা, যাতে শিশুকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করতে না হয় বা অকৃতকার্যতার দরুণ নিরুৎসাহ বোধ না করতে হয়।

(৩) শিশুর মাধ্যমে অভিভাবকদের নিজের আশা আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা না করে, বিজ্ঞোচিত উপায়ে এমনভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করা—যাতে সে জীবনে যথার্থ সুখ ও শান্তি পেতে পারে।

(৩) শিশুকে কেবলমাত্র বইয়ের পোকা না করে, সংসারে যাতে পাঁচ জনের সঙ্গে মিলেমিশে মানুষের মতন চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

## *কিশোর ও বিশেষ ধরণের ব্যক্তিগত গুণ*

এ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শক্তির কথা দু'একটি বলা দরকার।

কারুর মধ্যে কোন বিশেষ ক্ষমতা দেখলেই তাকে সেই লাইনে দেবার আগে, তার সাধারণ বুদ্ধিটাও বিচার করে দেখা দরকার। যেমন—এক জনের আঁকায় হাত ভালো থাকতে পারে। সে দেখে দেখে সব কিছু নকলও করতে পারে। কিন্তু যে প্রতিভাবলে শক্তিধর শিল্পী হওয়া যায়, তা যদি তার না থাকে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে তাকে দিলেও ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একজনের ব্যাটবল খেলার 'ন্যাক্' আছে খেলার কায়দাও ভালো—কিন্তু তার 'হার্ট' খারাপ, স্বাস্থ্যও ভালো নয়, সে ক্ষেত্রে তাকে পেশাদার খেলোয়াড় করে তুলতে যাওয়া কি ভালো? তাই বলে সাধারণ সখের খেলোয়াড় হতে বাধা দেওয়াও আমাদের উচিত নয়।

পড়াশুনার ক্ষেত্রেও তেমনি, কোন একটা বিষয়ে শক্তির

অভাবকে উপলক্ষ্য ক'রে, শিশু লেখা পড়ার উপযুক্ত নয় এই বিবেচনায় তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়াটা আরও খারাপ। এ ক্ষেত্রে এই বিশেষ দুর্বলতাকে আবিষ্কার ক'রে তা দূর করাই প্রয়োজন।

## সামাজিক বিকাশ

শৈশবে যত কিছু আগ্রহ, কৌতূহল সব গড়ে ওঠে শিশুর বাড়ী আর আপনার-জনকে কেন্দ্র করেই। এই সময় সে থাকে আত্ম-কেন্দ্রিক। 'আমার পুতুল', 'আমার বই'—এই ধরণের 'আমার' 'আমার' ভাবটা থাকে বেশী। ছোট ছোট দলে তারা মেলামেশা বা খেলাধুলা করলেও, বেশীর ভাগ সময়ই অন্যের সঙ্গে খেলে তারা আত্মতৃপ্তির জন্যে। পাঁচ-জনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে গেলে, যে-ত্যাগ, সহযোগিতা দরকার, সে বোধ তার মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। সামাজিক দৃষ্টিতে ভালো-মন্দর ধারণা তার কাছে যেমন ধরা হয়ে থাকে, সে সেই রকম শিখলেও কার্য ক্ষেত্রে বড় একটা প্রয়োগ করে না। ক্ষেত্রোপযোগী ব্যবহারের জন্য বড়দের সাহায্যের দরকার হয়। শিশু এই সময় তার নিজের দুর্বলতা, বৈষম্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও খেয়াল রাখে না। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে, সে যখন বিবিধ সামাজিক ব্যবস্থা ও ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হয়, তখন পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার ওপর বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে। এখন গৃহ আর তার কাছে কৌতূহল বা সর্বময় কর্তৃত্বের কেন্দ্র বলে মনে হয় না। অভিভাবকরাও এখন তার অনুকরণ প্রবৃত্তিকে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করেন না। এই সময় শিশুর মন নিজের দিক থেকে অন্যের দিকে—অর্থাৎ তারই মতন বাইরের অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দলের দিকেও টান হয়। যদিও এখন তার স্বার্থ কিছুটা আত্ম-কেন্দ্রিক থাকে, তবে অন্যের প্রতি বিবেচনা-পরায়ণতা, সহানুভূতি, নম্রতা, প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি

প্রভূত পরিমাণে দেখা দেয়। এই সময় কাম্য বন্ধুত্ব বজায় রাখতে সে অকাতরে নিজের প্রিয় জিনিসও ত্যাগ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

প্রথম কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এমন সব অভ্যাস, আচরণ এবং আদর্শ আয়ত্ব হয়ে যায়, যা পরবর্তী কৈশোরে তার সমাজ-জীবনকে সুস্থ পথে চালিত করতে সাহায্য করে। এই সময় শিশুর যে-জিনিসটি বিশেষভাবে শেখা দরকার, সেটি হচ্ছে এই যে, সে যদি অন্যের অধিকার ও দাবিকে মানতে না শেখে, তা হলে তার পক্ষে বন্ধু-জীবন লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমবয়সীদের দ্বারা আদৃত হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে তাদের প্রতি তার ব্যবহারের ওপর। শিশুর যাতে এই অর্ন্তদৃষ্টি জাগরিত হয় সেই জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত।

পরবর্তীকালে সামাজিক মানুষ হিসাবে শিশুর সুষম ও সুস্থ বিকাশের পথে যা আয়ত্ব করা দরকার তা হচ্ছে—

১। আপনার ক্ষমতা, অক্ষমতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি ইত্যাদি বোঝবার শক্তি।

২। নিজেকে অন্যের মধ্যে মানিয়ে চলার শক্তি।

৩। দোষ-গুণযুক্ত মানুষ হিসাবে অন্যকে গ্রহণ করার শক্তি।

## সামাজিক বিকাশের ধারা ও সংঘ-জীবন

সামাজিক ভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হলে যে, কতকগুলি অতি প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলা উচিত, সে শিক্ষা শিশুদের সুরু হয়, দলীয় জীবন থেকেই। দলীয় জীবনে তারা শেখে যে, অন্যের প্রতিও সহানুভূতিপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন, অন্যের আগ্রহ, কৌতূহল, ব্যক্তিগত ও বস্তুগত অধিকারকেও মান্য করা উচিত, ইত্যাদি। দলীয়-জীবন শিশুর সুষম বিকাশের পথে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে।

৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে একই ধরণের বিকাশ, আগ্রহ খেলা-ধূলা অন্য শিশুদের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি তাদের একসাথে জড়ো করে ও এমনি ভাবেই তাদের দল গড়ে ওঠে। এই দলগুলি অতি শৈশবের মেলামেশার চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়ে থাকে। বোধশক্তির বিকাশের সাথে সাথে তারা ভাবগ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করতে শেখে এবং অন্যের চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের তার একটা অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এই সময় ছেলেমেয়েরা এমন একটা আদর্শ খুঁজে বেড়ায়, যাকে কেন্দ্র ক'রে তারা জড়ো হতে পারে। একবার সেই আদর্শটী মনের মতন হলেই, তাদের মাঝে আনুগত্য, অন্তরঙ্গতা, একতা, সমগ্রতা, ত্যাগ, বিশ্বস্ততা সব কিছুই দেখা দেয় এবং এইগুলি একসাথে মিলে একটী কার্যকরী দল বা সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। এই রকম দল ভালো মন্দ দুই দিকেই যেতে পারে। যাই হোক, এখন থেকে আত্মসর্বস্ব শিশু, সবার সাথে মেলামেশার মাধ্যমে যে আনন্দ পায়, তারই জন্য সে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে শেখে এবং নিজেকে আর পাঁচজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের সাথেই সমান সুখের অধিকারী হতে চায়। এ ভাব শুধু যে খেলার মাঝেই দেখা যায় এমন নয়। ক্লাব গড়া, অভিনয় করা, বারোয়ারী পুজা করা, সেবাসমিতিতে যোগ দেওয়া এ সবের মধ্যেও দেখা যায়।

যখন থেকে ছেলেদের দলীয় জীবন সুরু হয়, তখন থেকে তাদের সমস্ত আগ্রহ ঐ দলের ওপর গিয়ে পড়ে। বাড়ীর প্রতি যেন আর তেমন তাদের টান দেখা যায় না। অভিভাবকেরা এই সময়টা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, ছেলেপিলেরা তাঁদের কথা মোটেই শোনে না, অথচ বন্ধু ডাকতে এলে তার আর টিকিটি দেখা যায় না। বাড়ীর সঙ্গে তার যেন কেবল খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধ। বাড়ীর নিন্দা প্রশংসার চেয়ে দলের মতামতই তার কাছে যেন বেশী। অভিভাবকদের বোঝা দরকার যে, বিকাশোন্মুখ কিশোরের পক্ষে এইটেই সুস্থতার লক্ষণ। কারণ, শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে

যে-সামাজিক মানুষে পরিণত হতে হবে তারই বীজ এখানে উপ্ত হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ভালো দল বা সঙ্গীসাথী কিশোরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। এতে তার শৈশবের আত্ম-কেন্দ্রিকতা দূর হয়, অন্যকে গ্রহণ করতে শেখে, নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতাকে বিচার করতে শেখে পরস্পর সহযোগিতার ভাব জাগে, ত্যাগ স্বীকার করেও অন্যের দাবীকে যে সমাজে মেনে চলতে হয়, সে কথা বুঝতে শেখে। বাড়ীর বাইরেও যে আর একটা জগৎ আছে, জীবনে তার নিন্দা-প্রশংসার মূল্য কতখানি সে সব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এই রকম পরস্পর ত্যাগ ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যে-মেলামেশার ভাব গড়ে ওঠে, তাতে শিশু সমাজগতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ, তা বুঝতে শেখে। এর জন্য বাইরের কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। যে সকল বাধা তাদের বিকাশের পথে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে ওঠে, তাকে অতিক্রম ক'রে তারা আত্মশক্তি সম্বন্ধে যেমন সচেতন হয়ে ওঠে, তেমনি আবার একসাথে পরাজয়কেও সহজভাবে মেনে নিয়ে তার গ্লানিকে দূরে রাখতে পারে।

যে-শিশুর জীবন, বাইরের আর পাঁচজনের মেলামেশার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না, সে-ই সাধারণতঃ হয়ে থাকে মুখচোরা আর লাজুক ধরণের। তার মধ্যে সাহসের থাকে অভাব। সব সময় তার মনে হয়, এই বুঝি পাঁচজনে তার সমালোচনা করছে—সেও বাইরের জগতকে গ্রহণ করতে পারেনা সহজভাবে। এমনিভাবে সবকিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে হয়ে ওঠে আত্ম-কেন্দ্রিক। তার মাঝে দেখা দেয় অতৃপ্তি ও নিজেকে ছোট করে দেখার ভাব এবং প্রায়ই সে এমন আদর্শ গড়ে তোলে যার ফলে জীবনে ব্যর্থতা আসে অবশ্যম্ভাবীভাবে।

এই জন্য তাদের কাছে বয়স্কাউট, গার্ল্স গাইড, মণিমেলা ইত্যাদি কিশোর সংঘগুলির দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হয়।

এই সংঘ-জীবনে তরুণ মনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক অভাব চরিতার্থ হবার উপায় থাকে বলেই, তার অবাধ ও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে তা সহায়ক হয়ে ওঠে।

## *কিশোর মন যা চায়*

কৈশোরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আগে আমরা যেটুকু বলেছি, তার থেকে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষ খালি দেহের দিক থেকেই বড় হয় না, তার মন বলেও একটা জিনিস আছে। এই মনের চাওয়া সব বয়সে সমান থাকে না। বয়স্ক মানুষ কি আর পুতুল খেলা ভালোবাসে? ভালোবাসে না। তেমনি কৈশোর কালেও ছেলে-মেয়েরা মনের মাঝে, শৈশবের চেয়ে ভিন্ন ধরণের অভাব বোধ করে। সেই অভাবগুলি কি আমরা যদি জানতে চেষ্টা করি, তাহলে কিশোরকে পরিচালনা করা সহজ হবে। দেখা গেছে, ছেলে মেয়েদের মধ্যে যেখানেই অসাফল্য ও অবাঞ্ছিত ব্যবহার বর্তমান, সেইখানেই তার আংশিক কারণ নিহিত রয়েছে তাদের এই বয়সের মনের অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলি না মেটার মধ্যেই।

আমরা কিশোর-মনের যে-ধরণের অভাবের কথা বলতে যাচ্ছি, তার বেশীর ভাগগুলির প্রকৃতি হলো সামাজিক—অর্থাৎ এই অভাব মেটাতে হলে প্রয়োজন হয় অন্য লোকের যোগাযোগের। এই অভাবগুলি কি ধরণের এখন দেখা যাক।

প্রাথমিক পর্যায়ে কিশোর মন চায় :—

(ক) ১। পরিবারের অন্তরঙ্গদের প্রীতি ও সখ্যভাব।
২। কাজে ও খেলায় সমবয়সীদের সপ্রশংস অনুমোদন।
৩। শিক্ষক, নেতা বা ঐ স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশংসা।

কোন গোষ্ঠির মধ্যে, একটি বিশেষ মানুষ হিসাবে এগুলির প্রয়োজনীয়তা আমরা, বোধ হয়, কেউই অস্বীকার ক'রতে পারি না।

বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়, সে-ক্ষেত্রে একটি প্রশংসাসূচক বাক্য, উৎসাহ, সহানুভূতি বা সখ্যতাপূর্ণ দৃষ্টি যে কত কাজ ক'রে থাকে, তা কিশোরদের যারা পরিচালিত করেন তাঁদের কারুরই অজ্ঞাত নয়। যে-শিশুরই শৈশব কথায় কথায় অবহেলিত হয়েছে, দিন কেটেছে যার শঙ্কায় আর তাচ্ছিল্যের মধ্যে, তাকেই নিয়ে অভিভাবকদের দেখা দিয়েছে পরবর্তীকালের সমস্যা। কিন্তু বাড়ীতে যদি এমন একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন, যাঁকে কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েরা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং তিনিও তাদের ভালোবাসেন যথার্থভাবে, তাহলে সেখান থেকে কৈশোরের বিদ্রোহাত্মক ভাব, অশান্তিকর সমস্যা অনেকাংশেই দূরীভুত হয়ে থাকে।

(খ) কিশোর মনের অপরাপর প্রয়োজনগুলির কথা বলতে গেলেই প্রথমে বলতে হয়, তার মনের দান ও প্রতিগ্রহের কথা। মানুষের মন যেমন পেতে চায়, তেমনি দিতেও চায়। কিশোর মন যা চায়, তা আগেই বলেছি। দেবার দিক দিয়ে সে চায় কতকগুলি কোমল প্রবৃত্তি প্রকাশ করতে। সে বোঝাতে চায় যে, অন্যের গুণাগুণ সেও যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে—প্রশংসা করার সুযোগ তাকেও দেওয়া দরকার। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থতার সুযোগ না থাকলে, কিশোর মন অত্যধিক ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যেই এর বিকল্প তৃপ্তি খোঁজে।

(গ) এর পরই বলতে হয়, মানুষের মনে অপরিচিত বা নূতন জিনিসকে জানার যে-ইচ্ছা সুপ্ত থাকে তার কথা। শৈশবে দেখি, শিশু ঘরের সব কিছু আতিপাতি করে দেখতে চায়; বাল্যে, পাঠশালার বা পড়শীদের সম্বন্ধে সে জানতে চায়। পরে আরো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতি সম্বন্ধে, দেশ সম্বন্ধে, সে ধাপে-ধাপে নতুন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। এই নতুন অভিজ্ঞতার দ্বারা কিশোর

মন নিজের মধ্যে যেন একটা সফলতা অর্জন করে; আত্মবিশ্বাস জাগরিত হয়ে তার মনে হয় যেন 'নতুন একটা কিছু জয় করলাম।' সামান্য আকারেও নতুন-নতুন এ্যাড্‌ভেন্‌চার কিশোর মনের সুষম বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কিশোর মনের এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি বর্তমানের বিদ্যালয়-জীবনটি গড়ে তোলা যায় তা'হলে—তরুণ সমাজের যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা শঙ্কা প্রকাশ করে থাকি, অনেকাংশে তা দূর করা সম্ভব বলে মনে হয়।

(ঘ) দায়িত্ব গ্রহণ করার ইচ্ছা। মানুষের মাঝে অতি শৈশব থেকেই আপন দায়িত্বে স্বাধীনভাবে কিছু না কিছু করার ইচ্ছা বর্তমান থাকে। যেমন—শিশু হয়তো নিজে থেকেই আপনাকে ছাতাটা লাঠিটা এগিয়ে দিতে চায়। চায়ের কাপ নিজেই বাইরের ঘরে বাবার কাছে দিয়ে আসতে অসীম আনন্দ পায়। এইরকম ছোটোখাটো কাজের মধ্যে দিয়ে সে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শেখে ও আপন কাজ দিয়ে সে অন্যকে, তথা পরিবার, সমাজ ইত্যাদিকেও সাহায্য করতে শেখে। কাজেই, ছোটদের নিজ দায়িত্বে বয়সমত কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। কিশোর-পরিচালকদেরও তাই উচিত যে, সংঘের ছেলে-মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে আপন দায়িত্বে কিছু না কিছু কাজ করতে পারে তার সুযোগ ক'রে দেওয়া। কাজ করতে করতে সাফল্য ও অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব কেমনভাবে পালন করতে হবে, তার শিক্ষাও ছেলেমেয়েরা এই ছোট-খাটো দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই পায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি শোকে-তাপে বা বিপদে-আপদে অত্যন্ত কাতর বা বিচলিত হয়ে পড়েন। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, হয়তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরণের লোকেরা তাঁদের ছেলেবেলায় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবার সুযোগ পান নি। কাজেই জীবনে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা' সহজেই অনুমেয়।

(ঙ) এই প্রসঙ্গে কৈশোরের স্বাধীনতাস্পৃহার কথাও কিছু বলা দরকার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর মন খানিকটা তথাকথিত বাঁধাধরার মধ্যে থেকে একটু স্বাধীন ভাবে চলে ফিরে বেড়াতে চায়। প্রতিটি কাজেতেই সে যদি বাধা পায়, আর প্রতিটি কাজের জন্যই যদি তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তখনি তার মন বিরূপ হয়ে ওঠে— এতে যদি সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আবার শাসনের ভয়ে সে যদি অতি নিরীহ ভালো মানুষটি হয়ে গিয়ে চিরকাল পরনির্ভরশীল হয়েই কাটিয়ে দিতে চায়, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কাজেই এই সময় আমাদের চিরাচরিত সামাজিক স্নেহের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করা দরকার। অনেকে ভাবতে পারেন যে, এই স্বাধীনতা দেওয়ায় ছেলে হয়তো উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যেতে পারে; কিন্তু অভিভাবকের দৃষ্টি যদি সুদূর-প্রসারী হয়, এতে ভয় পাবার কিছুই নাই। কিশোর মন বড়দের মতন ব্যবহার চায় বলেই সে যে বয়স্কদের উপদেশ মানতে চায় না, এমন নয়—সে স্বাধীনতাও চায়, শাসনও চায়। সবচেয়ে বেশী সে চায়—তার ওপর অভিভাবকের দৃঢ়বিশ্বাস ও পারিবারিক ভালোবাসা।

(চ) দলের প্রয়োজনীয়তা। কিশোর মনের সামাজিক বিকাশের কথা বলতে গিয়ে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। দল ও দলবদ্ধ কাজের মধ্য দিয়ে কিশোর মন পায় নতুন কাজ ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ, পায় নেতৃত্ব করার সুযোগ। জানতে পারে নিজের সুপ্ত কর্মশক্তিকে। অন্যের চোখে তারই কৃতকর্ম অনুমোদন লাভ করছে দেখে সে হয় তৃপ্ত। সাধারণতঃ সুষম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে দলীয়-জীবনের প্রভাব যে কতখানি তা' বলে শেষ করা যায় না।

(ছ) স্বাধীনভাবে খরচ করার ইচ্ছা। কৈশোর কালের পক্ষে এটা একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই সময় কিশোর মন

বহির্মুখী হয়ে ওঠে। প্রায়ই সে ইচ্ছামতো এটা ওটা কিনে, খেয়ে কিংবা খেলায় বা সিনেমায় কিছু পয়সা খরচ করতে চায়। কিন্তু প্রতিপদেই অভিভাবকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে পয়সা চাইতে সে লজ্জা বোধ করে ; কাজেই এই পয়সা জোগাড় করতে অনেকসময় তাকে অবাঞ্ছিত উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এই জন্য তাকে সাপ্তাহিক কিছু হাত খরচা দেওয়া যুক্তিযুক্ত। দেখা গেছে, এই সময় দাদু, দিদিমা, মাসীমা, বা ঐ স্থানীয় যে-লোকের কাছে সে চাইলে কিছু-কিছু পায়, তারই প্রতি কিশোরের আনুগত্যটি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। এর জন্য পিতামাতার ওপর থেকে আনুগত্য যদি অন্য লোকের ওপর সঞ্চারিত হয় এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

কিশোর মনকে পরিচালনা করতে হ'লে আমাদের তাই মনে রাখতে হবে তাদের মানসিক অভাবগুলির কথা এবং চেষ্টা করতে হবে তা মেটাবার। এরজন্য সুযোগ দিতে হবে তার কোমল বৃত্তিগুলি প্রকাশ করবার। নতুন ও অজানা ও কঠিনতর কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে সুযোগ দিতে হবে—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার। পরিবার ও দলের জন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে দিয়ে তাকে সুযোগ দিতে হবে বাইরের জগৎকে জানবার।

কিশোর জীবনে এই সময় অভিভাবকদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরালে শক্তির আধার হ'য়েই তাঁদের অবস্থান করা দরকার। উপদেশ, সহানুভূতি, উৎসাহ, দায়িত্ব যখন যা প্রয়োজন সেইরূপ সাহায্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস ও নবলব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি সবল ও সুস্থ ক'রে তোলা উচিত। আর একথাও বোঝা দরকার যে, গৃহই হ'লো আবেগ অনুভূতি বিকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান। পারিবারিক স্নেহ-ভালোবাসা, পারিবারিক জীবনে দেওয়া-নেওয়া, ত্যাগ, অন্তরঙ্গতা প্রভৃতির মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, অন্যের জন্যে ভাবতে শেখা, সত্য

সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ প্রভৃতি জাগাই কিশোরের সুস্থ ভাবাবেগ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন।

## ব্যক্তিগতভাবে কিশোর কি চায়

এই বয়সে কিশোররা ব্যক্তিগতভাবে কি চায়, সে প্রশ্ন ক'রে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা চায় যে, বড় ব'লে তাদের একটা স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং তাদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করা হোক। বন্ধুদের মাঝে তাদের একটা বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠিত হোক। ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার সহজ ও সরল হ'য়ে উঠুক।

এখানে কিশোরদের মনের ইচ্ছার কতগুলি তালিকা দেওয়া হ'লো—অনুসন্ধানী পাঠকরা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে দেখতে পারেন এটা ঠিক কি না ?

## বড় হয়েছি এটা স্বীকার করা হোক এই পর্যায়ে

১। বাড়ীতে আমি একটু নিজস্বতা ( Privacy ) চাই।
২। আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই করতে চাই।
৩। আমি কোন একটা বিষয়ে কৃতবিদ্য হ'তে চাই।
৪। আমি আর সকলের মতন বড় হ'তে চাই।
৫। আমি বন্ধুবান্ধব চাই ও তাদের প্রিয় হ'তে চাই।

## নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পর্যায়ে

১। আমি নতুন-নতুন দেশ দেখে বেড়াতে চাই।
২। আমি নতুন বন্ধু করতে চাই।
৩। আমার জ্ঞান ও দৃষ্টি বাড়াতে চাই।

## স্নেহাকাঙ্খীর পর্যায়ে

১। আমি বাবা-মার বিশ্বাস ও উপদেশ চাই। অর্থাৎ, তাঁদের

আমি আমার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহৃদয় বন্ধুর মত পেতে চাই।

২। বাড়ীতে ও সমাজে আমার মতন লোকেরও যে একটা প্রয়োজন আছে তা আমি বুঝতে চাই।

৩। নিজের জীবনকে গ'ড়ে তোলার মতন নৈতিক শিক্ষাও চাই।

কিশোর মনের এই মানবোচিত অভাবগুলির কথা স্মরণ রাখলে, কৈশোরের সাধারণ বা অসাধারণ ব্যবহারগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হ'য়ে উঠবে এবং আমরাও তাদের অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে বয়স্ক মানুষ হ'য়ে উঠতে সাহায্য করতে পারবো।

## অভিভাবক ও কিশোরের সম্বন্ধ

একসময় অভিভাবকদের মনে এমন একটা ধারণা বর্তমান ছিল যে, যেহেতু তাঁরা পিতা বা মাতা, সেইহেতু তাঁরা সর্বগুণাধার, জ্ঞানাধার, অভ্রান্ত দেবতা বিশেষ। পুত্র-কন্যা তাঁদের সম্পত্তি, তাই তাদের ওপর যথেচ্ছ ব্যবহার তাঁরা করতে পারেন। এ-সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা যদি কিছুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে তাহলেই তারা অবাধ্য ও কুলাঙ্গার। অভিভাবকদের মনে রাখা উচিত যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সময় বাধ্যবাধকতার যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তার মানে এই নয় যে, তারা বাবা-মাকে আগের থেকে কম ভালোবাসছে বা কম শ্রদ্ধা করছে ; বরং এই কথাই মনে রাখতে হবে যে, তারা অভিভাবক ও তাঁর ব্যবহারকে স্বাধীন সমালোচকের দৃষ্টি দিয়েই দেখছে—এর মধ্যে তার ভুল ত্রুটি হয়তো থাকতে পারে কিন্তু দোষের কিছু নেই। কিন্তু বিপরীত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে চলাতে এর জন্য পিতা-পুত্রে যে কতো মনোমালিন্য ও মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটেছে তার আর শেষ নেই।

কৈশোরের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার স্পৃহাকে অভিভাবকরা অনেক সময় এমনভাবে নেন যে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় দু'ভাবে। প্রথম—ছেলে বেয়াড়া হ'য়ে উঠেছে মনে ক'রে

অনেকে এমন কড়া শাসন সুরু করেন যে, কিশোরের দেহ মন সবই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয়—আবার অনেকে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে—'যাকগে—গোল্লায় যাক্' ব'লে এমন একটা ভাব দেখান, যাতে ছেলের গোল্লায় যাবার পথই প্রশস্ততর হ'য়ে ওঠে। দুই-ই চরম পন্থা এবং পিতা পুত্রের স্নেহ ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টিই পরিত্যাজ্য।

এক শ্রেণীর অভিভাবক আছেন, যাঁরা ছেলেমেয়ের সম্মান বা বাধ্যবাধকতার—কোনটারই প্রত্যাশী নন। তাঁরা চান, তাঁদের কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে পরিগণিত হ'তে। এতেও তাঁদের হতাশ হ'তে হয়, এবং ভবিষ্যতে তাঁরা মনে এমনও বোধ করেন যে, সন্তান যেন তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অভিভাবকদের মনে রাখা উচিত, কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়ে আর তাঁদের মধ্যে বয়সের, চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন তফাৎ যে, তারা তাঁদের হৃদ্যতা কামনা করলেও, ঠিক অন্তরঙ্গ সমবয়সী বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না বা ঐরূপ আলোচনাও তাঁদের সঙ্গে করতে পারে না। বাপ-মা যতই আধুনিক মনোভাবাপন্ন হোন না কেন বা যতই তরুণ ভাবাপন্ন হোন না কেন—তাঁরা অভিভাবকই রয়ে যাবেন। কিশোর-পরিচালক বা শিক্ষকরাও নিজেদের ঐ রকম কিশোর-বন্ধু মনে ক'রে অনেক সময় ভুল ক'রে থাকেন—এর চেয়ে যদি আপনি তাদের চোখে যা তাই, এই ভাবটি বজায় রেখে—অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বটি বজায় রেখে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন ও তাদের মতন তাদের চলতে দেন, তাতে মনে হয় সুফল পাওয়া যেতে পারে বেশী।

অভিভাবক ও কিশোরের মধ্যে বন্ধুভাব গড়ে ওঠবার আর একটি অন্তরায় হচ্ছে, কিশোর-মনে নিজের মতন একটি নিভৃত জীবন যাপন করার আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা তার পোষাক-পরিচ্ছদ

নির্বাচনে, বন্ধু নির্বাচনে, পুস্তক নির্বাচনে, স্বাধীন চলা-ফেরা ইত্যাদিতে দেখা দেয়। কিশোরের এই ধরণের নিভৃতাচরণে যদি আমরা জোর করে হস্তক্ষেপ না করি, তাহলেই বরং তাদের হৃদ্যতা লাভ করা সহজ হয়ে ওঠে।

এ-ছাড়াও আবার এমন অভিভাবক আছেন, যাঁরা তাঁদের জীবনে সন্তানকে এমন ভাবে আঁকড়ে থাকতে চান যে, যখন তাঁরা দেখেন শৈশব থেকে শিশু কৈশোরে পা দিয়ে নিজের মতন চলতে চায়, তখন সন্তান দূরে সরে যাচ্ছে মনে ক'রে অত্যন্ত অসুখী বোধ করেন এবং এর ফলও পরবর্তী কালে বিষময় হ'য়ে ওঠে।

স্বার্থপরতার সঙ্গে কতকগুলি কোমল বৃত্তিকে অযথা হৃদয়ে পোষণ করার দরুণ অভিভাবক-সন্তানের সম্বন্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের ভবিষ্যৎও বেদনাদায়ক হ'য়ে ওঠে। কাজেই যখন থেকে শিশুরা পরনির্ভরতা কাটিয়ে উঠছে, তখন থেকে এই হৃদয়-দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে অভিভাবকেরা যদি তাদের সঙ্গে বিজ্ঞোচিত ব্যবহার করেন, তা হলেই সকল দিক থেকে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

সংসারে পিতা-পুত্রের এই সম্বন্ধ স্থায়ী করা যায় তখন, যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের ব্যক্তিত্ব ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করি, পরস্পরের কৃতজ্ঞতা, আগ্রহ, ইচ্ছা, সমস্যা ও সুখের প্রতি নজর রাখি এবং সুখ, শান্তি, হতাশা, পরাজয় ও অশান্তির কারণ-গুলির সম্বন্ধে উভয় পক্ষই সজাগ দৃষ্টি রাখি।

## কোন্ ধরণের গৃহ কিশোর মনের উপযোগী

বয়সের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এই সম্বন্ধটি গ'ড়ে তুলতে হ'লে শৈশব থেকেই তাদের পারিপার্শ্বিকটি গ'ড়ে তুলতে হয়। অভিভাবক-অভিভাবিকা, গৃহ, ও পারিবারিক প্রভাব শিশু ও কিশোর মনের উপর বিশেষ ভাবে কাজ ক'রে থাকে। কাজেই কোন্ ধরণের

পরিবেশ কিশোর মনের উপযোগী সেটা আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। ঘরে-ঘরে তথাকথিত একটা আদর্শ পরিবেশ রচনা করার কথা বলতে গেলে সেটা পুঁথিগত উদ্দেশ্যের কথাই শোনাবে। তবে সাধারণভাবে আমরা কিশোর-কল্যাণের জন্য এইটুকু বলতে পারি যে, যে-বাড়ীতে কিশোর-বয়সী ছেলে-মেয়েরা নিঃশঙ্ক নির্ভরতা পায় এবং যেখানে তারা প্রীতি, স্নেহ ছাড়াও বাড়ীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার হিসাবে গণ্য হয়, যেখানে সে তার পছন্দমত বন্ধুদের অভ্যর্থনা ক'রে আনতে পারে, যেখানে সে শিক্ষা পায় পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কেমন ক'রে নিজের সাধারণ সুখ-দুঃখও ভোগ ক'রতে হয়, যে বাড়ীতে সাজার চেয়ে শৃঙ্খলা বোধ থাকে বেশী, যেখানে কিশোরের একটু নিজস্ব গৃহকোণ বর্তমান, যেখানে বাবা-মার অহেতুক উদ্‌বিগ্নতা বা অতি আদর নেই, যেখানে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি চরিতার্থ করবার সুযোগ আছে, পরিবারের পরস্পরের প্রতি যেখানে শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতিপূর্ণ ভাব বর্তমান, যে পরিবারে বৈচিত্র্য আছে, যেখানে পিতা মাতার ভাবাবেগ পূর্ণতা লাভ করেছে, যে পরিবার—কথায়-কাজে অভিন্ন, যেখানে দৈনন্দিন শিক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে পরার্থে নিয়োজিত হয়, সেই পরিবেশেই সকলের অলক্ষ্যে কিশোরপ্রাণ সুস্থ ও সবল-মনা মানুষ হ'য়ে গড়ে ওঠে।

## অভিভাবকদের বিরুদ্ধে কিশোর মনের কয়েকটি সাধারণ অভিযোগ

উপরের কথা বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়তো হাস্যোদ্রেক করতে পারে, কিন্তু কিশোরের প্রকৃত কল্যাণকামী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই এই দিকটি এড়িয়ে যাবেন না। কারণ জানবেন, পিতামাতার বিরুদ্ধে কৈশোরের বিদ্রোহাত্মক ভাবের মূলে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি কাজ ক'রে থাকে। বাড়ীর বিরুদ্ধে কিশোরদের নানান অভিযোগের মধ্যে আমরা

যেগুলির পরিচয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেয়েছি, সেগুলির মাত্র কয়েকটির এখানে উল্লেখ করলাম।

১। বাবা-মা ভাবেন, তাঁরাই সব সময় ঠিক। আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগই দেন না ; বরং বলতে গেলেই ধম্‌কে দেন।

২। আমার মা-বাবা দোষ না থাকলেও সব সময়ই আমাকে বকেন আর একটুতেই মারেন। সত্য কথা বল্‌লেও বাড়ীতে বিশ্বাস করতে চায় না, এতে আমার মন বড় খারাপ হয়।

৩। বাবা সব সময়ই আমাকে বড্ড ছেলেমানুষ মনে করেন তা আমার পছন্দ হয় না।

৪। বাবা-মা আমার জন্ম বল্‌লেও কোনদিন বই বা খেল্‌না কিনে দেন না বা কোথাও নিয়ে যেতে চান না।

৫। বাবা-মা আমার সব বন্ধুদেরই বখা মনে করেন আর তাদের সঙ্গে খেলতে গেলেই বকেন।

৬। নিজের পছন্দমত জামা কাপড় বা খাওয়া-দাওয়া করতে গেলেই বাধা পাই।

৭। বাড়ীতে রাতদিন খালি পড়া নিয়ে খেচাখেচি করেন, আমার কোথাও বেড়াতে যাওয়াও মানা।

৮। ছোট ভাইকে সব সময় কোলে-কোলে কাছে-কাছে রাখতে ভালো লাগে না—নিজের মতন একটু বেড়াবার জোও নেই।

৯। ইচ্ছেমত কিছু খরচা করতে চাই, কিন্তু পয়সা বাবার কাছ থেকে মোটেই পাওয়া যায় না।

১০। পুরানো একটা দোষ নিয়ে দিনের পর দিন কথা শুনতে ভালো লাগে না।

## *গৃহে কিশোরের বিদ্রোহাত্মক ভাব—তার কারণ ও দূরীকরণের উপায়*

কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আমরা প্রায়ই যে-বিদ্রোহাত্মক

ভাব দেখতে পাই, সেটা ঠিক তাদের বয়সের স্বভাব বলেই যে দেখা যায় তা নয়। তারা শৈশবে ও কৈশোরে যে-পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয় সেটাই এরজন্য বেশী দায়ী। কারণ হিসাবে সামাজিক ব্যবহার ও তার প্রতিক্রিয়াটাই মুখ্য, বয়সানুপাত গৌণ।

বিচার করলে দেখা যায় কৈশোরের বিদ্রোহাত্মক ভাবের মধ্যে সত্যিকারের কারণ খুবই কম থাকে। যে-সব কারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়, আসলে সংসার সমুদ্রের শান্ত পরিবেশে সেগুলি এক-একটা ঢেউ মাত্র। এই সব ঘটনা যদি স্থির মস্তিষ্কে সহানুভূতির সঙ্গে অভিভাবকরা বিচার করেন, তাতেই সুফল পাওয়া যাবে বেশী।

আসলে যে-সব কারণে অভিভাবকের সঙ্গে কিশোরদের মনোমালিন্য হয় ও যার ফলে কিশোরদের মনে বিদ্রোহাত্মক ভাব জাগে, সেইসব কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ী ফেরার সময় নিয়ে, বাড়ীর বাইরে বেশীক্ষণ সময় কাটানো নিয়ে, স্কুলের পড়াশুনার রিপোর্ট নিয়ে, পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে, বন্ধুনির্বাচন নিয়ে, হাতখরচা নিয়ে, অতি শাসন নিয়ে, ভাইবোনকে বা সমবয়সী কাউকে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করা নিয়ে, দৈহিক দুর্বলতা বা মুদ্রাদোষাদির ওপর টিপ্পনীকাটা নিয়েই কিশোর মনে বিদ্রোহের ভাব জাগে।

১২।১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করে দেখা গেছে, যে-সব কারণে তারা মনে মনে অভিভাবকের বিরুদ্ধে গোমড়ানো ভাব পোষণ করে ও বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, তার মধ্যে অভিভাবকদের অতি শাসন, চড়া মেজাজ, খিট্‌খিটে ভাব, অতিরিক্ত চিন্তা-গ্রস্ততা, সর্বদাই দোষধরা, কিশোরের প্রতি শিশুজনোচিত ব্যবহার ইত্যাদি কারণই প্রধান।

বাইরের লোকের কাছে অযথা অতি প্রশংসা বা ত্রুটিসূচক কিছু বলা কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েরা তেমন পছন্দ করে না। এই

সময় অনেকে আবার বাড়ীর পরিবেশ ও আদর্শ উচ্চধরণের হোক, এই কামনা ক'রে অভিভাবকের মধ্যে রুচির পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে ; ফলে, এই আদর্শের সংঘাতের জন্যও অভিভাবকের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা যায়।

বিদ্রোহাত্মক ভাবের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা যত শঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিশোররা কিন্তু তত শঙ্কিত বোধ করে না। পারিপার্শ্বিকের ব্যবহারের ফলে তাদের মনে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেইটাই তারা প্রকাশ করে। এর মূলে রয়েছে, তাদের মনের প্রাথমিক চাহিদা বা অভাবগুলি তৃপ্ত হবার ইচ্ছা, এর সঙ্গে তাদের বয়স্ক মানুষের ব্যবহার পাবার ইচ্ছাও যুক্ত হয়ে থাকে।

কিশোররা চায়, বাবা-মা তাদের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ ও বন্ধু ভাবাপন্ন হন, বৃহত্তর জগতকে বুঝতে তাদের সাহায্য করুন। এই বাসনা তৃপ্ত বা অতৃপ্ত হবার মধ্যেই তাদের সুস্থ বিকাশের পথ সুগম হয়ে ওঠে।

## কৈশোরের অবাঞ্ছিত ব্যবহার

আগেই বলে রাখা ভালো যে, যে-সকল অবাঞ্ছিত ব্যবহারের জন্য শিশুরা অপরাধীর পর্যায়ে পড়ে আমরা এখানে সে সব আলোচনা করবো না। (সে-সব আলোচনা 'শিশু অপরাধ ও অপরাধী' পুস্তিকাটিতে পাবেন।) ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েরা যে অবাঞ্ছিত ও দূষণীয় উপায় গ্রহণ করে থাকে এবং সময় মত হস্তক্ষেপ না করলে যাদের পাকা অপরাধী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাদের কথাই এখানে সামান্য ভাবে বলা হবে।

যাঁরা শিশু-অপরাধ নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, তাঁরা বলেন, পাকা অপরাধী বলে যারা গণ্য হয়, তাদের জীবনে অবাঞ্ছিত ও

দুষণীয় ব্যবহার সুরু হয় কিশোর বয়স আসবার আগেই। আর এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০টি ক্ষেত্রেই গৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই এর জন্য দায়ী। পারিবারিক আর্থিক অবস্থাও অনেকাংশে এর একটি কারণ বলে ধরা হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, 'প্রকৃত গৃহ' বলতে যা বুঝি, এসব ক্ষেত্রে তার সুযোগ সুবিধার অভাবও বর্তমান। ফলে, অবাঞ্ছিত ব্যবহারকারীর মানসিক ভাবাবেগগুলির পুর্ণ বিকাশ হয় না ও স্নেহ-ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত হয় না। এদের মধ্যে স্বার্থপরতা, অত্যধিক রাগ, হিংসা, অসন্তোষ, আত্মসংযমের অভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইত্যাদি দেখা যায়।

অবাঞ্ছিত ব্যবহারকারী বা অতি দুর্দান্ত শিশুর ভবিষ্যৎ নিচের কারণগুলি অবহেলার জন্য অনেক সময়ই সমস্যার সৃষ্টি ক'রে থাকে। কাজেই এই বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

১। যখন কৈশোরের বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার সুযোগ না থাকে।

২। যখন পার্থিব প্রয়োজনগুলি থেকে কিশোর মন বঞ্চিত থাকে।

৩। যখন কিশোরের অন্তর, স্নেহ, ভালোবাসার অভাবের দরুণ অতৃপ্ত থাকে।

৪। যখন শিশুর পারিপার্শ্বিক আদর্শহীনতা, কুৎসিত দরিদ্রতা ও পঙ্কিলতায় পূর্ণ থাকে।

৫। যখন শিশু নিজেকে অন্যের তুলনায় অত্যন্ত হীন বা দুর্বল মনে করে। ( কারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত আচরণ এনে থাকে। )

৬। যখন শিশু অত্যন্ত খামখেয়ালী হয় বা যখন সাধারণের তুলনায় তার বুদ্ধিবৃত্তি পূর্ণতা লাভ করে না।

৭। কিশোরকে যখন অতিশাসন ও প্রতি কাজে নিষেধের সম্মুখীন হতে হয়।

৮। অনেক সময় পাঠ্য বিষয়, ও পাশের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপণও শিশুর অবাঞ্ছিত ব্যবহারের জন্য দায়ী হ'য়ে থাকে। পাঠ্য বিষয় শিশুর পক্ষে অতি সহজ বা অতি কঠিন হওয়া—দুই-ই খারাপ। কঠিন হওয়াতে প্রায়ই সে নিজেকে অপরের থেকে হীন মনে করে থাকে। সেইজন্য অনেক সময় স্কুলের কাজে সহযোগিতা না ক'রে, মারপিট ইত্যাদির দ্বারা নাম কেনার চেষ্টা করে। আবার অন্যক্ষেত্রে উচ্চবুদ্ধির অধিকারী ছাত্র, সহজেই তার পাঠ আয়ত্ত ক'রে অবশিষ্ট সময় অন্যভাবে কাটাতে গিয়ে যার-তার সঙ্গে মিশে, প্রায়ই নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। কাজেই কিশোরের অবসর সময় যাতে সুপরিচালিত হয় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

## প্রতিকারের ইঙ্গিত

অবাঞ্ছিত ব্যবহারকে দূরে রাখবার জন্য এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি, যা এই ব্যাপারে সবক্ষেত্রেই আভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে আমরা এখানে এইটুকু ইঙ্গিত দিতে পারি যে, কেমনভাবে চললে এসব ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যেতে পারে।

শিশুর ব্যক্তিত্বকে হয়তো পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করার দরকার হ'তে পারে। তার মনের অন্তর্নিহিত উদ্বেগ, বাবা-মার স্নেহের অভাব, হীন-মন্যতাভাব—এসব দূর করা প্রয়োজন হ'তে পারে। আর শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে তাকে সচেতন হ'তে সাহায্য করা দরকার হ'তে পারে। হয়তো তার পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ও শিক্ষা পুনর্সংগঠনেরও দরকার হ'তে পারে। ব্যক্তিগত-ভাবে কিশোর মনের ভাবাবেগ ও প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি যাতে তার সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে পূর্ণ হ'তে পারে, এমন

পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনও অনুভব করা যেতে পারে। এই সব নির্দেশগুলি তখনই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে, যখন কোন বয়স্ক লোকের প্রতি কিশোরের যথাযথ বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকে। এ ছাড়া তার পক্ষে এমন আদর্শের প্রয়োজন, যাকে অবলম্বন ক'রে সে আদর্শ চরিত্রগঠন করতে অনুপ্রেরণা পেতে পারে।

অবাঞ্ছিত ব্যবহার ঘটলে আগে তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার ও পরে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অনেক সময় অভিভাবকরা ছেলেমেয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেন— এটা অন্যায় ; কারণ তাদেরও বোঝা দরকার যে, সমাজের একজন হ'য়ে থাকতে গেলে তার অসামাজিক আচরণ অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একটা অবাঞ্ছিত আচরণ ভুল বশতঃ করলেও সেটা যাতে চরিত্রের ওপর স্থায়ী আসন লাভ না করে সে বিষয় দেখা দরকার নয় কি ? এ ক্ষেত্রে মনীষী রলাঁর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলেই মনে হয়। "ভুল করলেই ওরা ( তরুণরা ) ভালো ক'রে শেখে, তাতে যদি খানিকটা চামড়া কাঁটা ঝোপে আটকে থাকে তাকে স্বাস্থ্যকরই বলতে হবে।"

## *কৈশোরের কয়েকটি বিশেষ অবাঞ্ছিত আচরণ*

### *বাড়ী থেকে পালানো*

কিশোর বয়সে অনেক সময়ই দেখা যায় যে ছেলেরা না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়। বাড়ী থেকে পালানো অভ্যাসকে মোটেই হেলার চোখে দেখা উচিত নয় ; কারণ, এর থেকে পরে কিশোরের পক্ষে স্থায়ী অপরাধী হওয়া খুব আশ্চর্য নয়।

দেখা গেছে, বাড়ীতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার অভাবই বাড়ী থেকে পালানোর কারণ হ'য়ে থাকে। বাড়ীতে বাবা কিংবা মা, বা উভয় অভিভাবকের অভাব, স্নেহের অভাব, অন্যায় শাসন বা অতি শাসনও এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। পরীক্ষা সংক্রান্ত অকৃতকার্যতা ও সেই হেতু অবশ্যম্ভাবী লজ্জা ও হীনতা বোধও সময় সময় এর সঙ্গে

জড়িত থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বাড়ীর অস্বাভাবিক পরিবেশ ও অভাব এর জন্য দায়ী—আর প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-পরিবারে ছেলেমেয়ে অনেক, সেই পরিবারের ছেলে এবং বাড়ীর বড় ছেলেরাই পালায়। ৬৬০টি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রায় অর্দ্ধেকের ওপর ছেলে স্নায়বিক স্বভাবের, বেশী রকম চটামেজাজের ও অধৈর্য্যপরায়ণ। অনেক সময় বৈচিত্র্য ও নতুনের সন্ধানের আকাঙ্ক্ষাও ছেলেদের একঘেয়ে পরিবেশ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

প্রতিশোধক হিসাবে কিশোর মনের কৌতূহল ও এ্যাডভন্‌চারের স্পৃহা যাতে আংশিক-পরিচালনে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দেশভ্রমণ, ক্যাম্প-জীবন ও সমাজসেবার কাজও এদিক দিয়ে সহায়ক। অতিশাসন ও স্নেহাঞ্চলের থেকেও কৈশোরকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

## চুরি

কৈশোরের চুরি জিনিসটা সাধারণতঃ একটা মানসিক দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ। বাড়তি বয়সের ছেলেরা অন্যের কাছে স্বাধীনতা দেখানো ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় হিসাবেই এটাকে নিয়ে থাকে। গৃহের হীন-পরিবেশ, সুপরিচালনার অভাব ইত্যাদিও চৌর্যের কারণ হ'য়ে থাকে। অনেক সময় অর্থের প্রয়োজনে বা সামান্য ছুট্‌কো-ছাট্‌কা জিনিসের অধিকারী হওয়ার গৌরব বোধের দরুণও তারা চুরি ক'রে থাকে। পরের জিনিস সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না-হওয়াও একটা কারণ। অনেক সময় ফল-ফুল চুরি করার মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছাও কাজ ক'রে থাকে।

ছেলেদের প্রয়োজনমতো ছেলেমানুষী অভাব মেটানো বা কিঞ্চিৎ হাত খরচার ব্যবস্থা রাখলে, এ-দিক দিয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সুযোগ, স্বাস্থ্যকর আমোদ-প্রমোদাদির ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা

অর্থাভাব, অমিতব্যয়িতা ও আদর্শহীনতা জনিত কারণগুলি দূর করা যেতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে পুনঃ শিক্ষারও প্রয়োজন হ'তে পারে।

## আত্মহত্যা

বিশেষজ্ঞরা কৈশোরে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান ক'রে বলেছেন যে, এই বয়সে কিশোর মনের চিন্তাধারা, আলাপ আলোচনা, যুক্তি—প্রচলিত মত, ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদি সব কিছুকে পাল্টে দেয়। সেই সঙ্গে নতুন ক'রে গ'ড়ে উঠতে থাকে তার জীবন-দর্শন, ধর্মের ধারণা, সামাজিক বিশ্বাস ইত্যাদি। এই নতুন ধ্যান-ধারণার জন্য সে নিজেকে ধ্বংস করার সম্বন্ধে এক অভাবনীয় ধারণা করতে থাকে। আত্মহত্যা সম্বন্ধে যে-ভয় থাকে, তা দূর হ'য়ে যায় এবং কোন কারণে জীবন ধারণ যখন তার কাছে অসহ্য মনে হয়, তখন নিজেকে ধ্বংস করতে তার এতটুকু দ্বিধা হয় না।

এই প্রসঙ্গে যে-সকল আলোচনা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু-না কিছু মানসিক বৈকল্য ঘটে থাকেই। এর ফলে এদের মধ্যে দেখা দেয় বিকৃত-চিন্তা, মানসিক অবসাদ, ভাবাবেগের গোলযোগ, আত্মসংযমের অভাব ইত্যাদি। ঘটনা চক্রের প্রবাহে নিজের জীবন-ধারাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোও মনের দিক থেকে এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব'লে বোধ হয়। অনবরত মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে আত্মসংযম শক্তি যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে বা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, তখনই অবস্থা চরমে ওঠে।

অঙ্গহানি, হতাশা, রোগযন্ত্রণা, যৌনজ-অপরাধ এই গুলিও অনেক সময় আত্মহত্যার কারণ হ'য়ে থাকে। যে-সব ঘটনায় কিশোর মনে এইরকম একটা ভাব জন্মায় যে, জীবনে তারজন্য দুঃখ-দুর্দশা আর হতাশা ছাড়া কিছুই নেই বা জীবনে তার স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা কিছুই নেই—সেইসব ঘটনাই তার মনে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে

জাগিয়ে তোলে। মা বাবার ওপর রাগ ক'রে, তাঁদের দুঃখ দিয়ে প্রতিশোধ নেবার বাসনাও অনেক সময় আত্মহত্যার প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। সময়-সময় ছোটখাটো ঘটনা, ব্যক্তিগত অসামঞ্জস্য বা অসুবিধা যা বড়দের কাছে অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হয়, তাও কিশোর মনে এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকে।

এই অকাল ধ্বংসের হাত থেকে বিকাশোন্মুখ জীবনগুলির সামনে তুলে ধরতে হবে ঘটনামূলক এমন জীবন-দর্শন, যার দ্বারা তারা আপন আপন জীবনে সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে পারে ও সেগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া, আত্মহত্যার প্রতি যাতে তার বিরূপ মনোভাব গ'ড়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। মানুষের জীবন যে বন্ধু, স্বজন, পরিবার, সমাজ ও জাতির বৃহত্তর কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত, এই ভাব কিশোর মনে জাগাতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। যার কাছে কিশোর মন অকপটে সব কথা খুলে বলতে পারে এবং যাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সে লাভবান হ'তে পারে, এইরকমের বন্ধুস্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তি এদিক দিয়ে বিচলিত-মনা কিশোরকে সাহায্য করতে পারেন। কিশোর মন থেকে ইহলোক ও ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ও বিরূপ ধারণা দূর ক'রে এই সংক্রান্ত প্রকৃত আলোক পাতের ব্যবস্থা করলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞোচিত উপায়ে আত্মসংযম ও যৌন শিক্ষার দ্বারাও অনেক ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

প্রকাশমান ব্যক্তিত্বকে তার গতিশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যাতে সহজে খাপ খাওয়ানো যায়, সেই উপায় অবলম্বন করলে অনেক তরুণ জীবনকে অকাল ধ্বংস ও মানসিক বৈকল্যের থেকে দুরে রাখা যেতে পারে।

## *দিবাস্বপ্ন*

কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই মনে-মনে নিজেরা আদর্শ তৈরী

ক'রে নিজেকে মস্ত একজন কেউ বলে কল্পনা করতে থাকে। নিজের পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিটির মতন ক'রে নিজেকে গড়তে চায়। হয়তো সে স্বপ্ন দেখে যে, সে একজন মস্ত ক্রিকেট বা ফুটবল খেলোয়াড় হ'য়ে উঠেছে বা মস্ত একজন অভিনেতা বা আবিষ্কারক হ'য়ে উঠেছে। দেশ জোড়া তার নাম-ডাক। এই ধরণের কল্পনা সাধারণতঃ সুস্থ বিকাশেরই লক্ষণ। কল্পনা শক্তি না থাকলে জীবনে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা কঠিন, তাই ব'লে অতিরিক্ত 'আকাশ-কুসুম' রচনাও ভালো নয়—তা' কর্মশক্তিকে দুর্বল ক'রে তোলে। বাস্তবকে মানুষ এড়িয়ে গিয়ে যখন আপনার অপূর্ণ-ইচ্ছাকে পুর্ণ দেখবার জন্য অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় নেয়, তখনই তা 'দিবাস্বপ্নে' পরিণত হয়।

অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এড়াবার জন্য, মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য, অপুর্ণ ইচ্ছাকে পুর্ণ দেখবার ইচ্ছায় কিশোর-মন প্রায়ই 'দিবাস্বপ্নে' ভোগে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, যেসব ছেলে-মেয়েদের বিকাশ শৈশব থেকে যথাযথ ভাবে হয় না—যারা বয়স অনুপাতে জীবনকে জানবার ও তার থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার শিক্ষা পায় না, তাদেরই সাধারণতঃ মনমরা হ'য়ে 'দিবা স্বপ্নে' মগ্ন হ'তে দেখা যায়। অভিভাবক হিসাবে আমাদের দেখা উচিত যে, ছেলে-মেয়েদের ধ্যান-ধারণা যাতে আকাশস্পর্শী হ'য়েও যেন একেবারে মাটি ছেড়ে না যায়। সে যেন বহু দিনের সুখ-দুঃখে মাখা এই পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে। তাদের অন্তত এই ভাবে বুঝতে আমরা সাহায্য করতে পারি যে, কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই সাফল্য অর্জন করা যায়—'দিবাস্বপ্ন' দ্বারা যায় না। তাই বলে কিশোরের সব কিছুকেই সমালোচনা ক'রে তার সব কাজকে ছোট ক'রে দেখলে তার পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়াবে। কারণ, এই সময় নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আগেই সচেতন হ'য়ে উঠেছে।

শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষা, সামাজিক কার্যাদিতে আত্মনিয়োগ, আবৃত্তি

অভিনয়াদিতে অংশ গ্রহণ—এই সবের মধ্যে দিয়ে 'দিবা স্বপ্নকে' কতক পরিমাণে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

## কৈশোরের খেলাধুলা

বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, ছোটদের খেলাধুলার ধরণ-ধারণও বদলাতে থাকে। যে-শিশু একসময় পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসতো, ১০।১২ বছর বয়সের সময় তাকে আর পুতুল খেলায় মগ্ন দেখা যায় না। দেখা যায়, তার শৈশব-সুলভ চাপল্য, খেলাধুলো, তার পছন্দ-অপছন্দ ক্রমে বয়স্কদের মতন রূপ নিচ্ছে।

কৈশোরে দল বেঁধে খেলার ইচ্ছাটা বাড়তে থাকে। এর আগে, প্রাক-কৈশোরের খেলার মধ্যে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ইচ্ছাটা বেশী থাকে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সুসংবদ্ধভাবে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে খেলা খেলতে শিশুরা আগ্রহ দেখায় ও এই সময় দলীয় ভাব বা 'টিম্ স্পিরিট্' দেখা দেয়। এই ভাব আস্তে আস্তে কমে গেলেও সারা কৈশোরকালে প্রবল ভাবেই রয়ে যায়।

ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলোর মধ্যে তফাৎটা বেশী থাকে, কৈশোরের চেয়ে শৈশবেই বেশী। প্রাথমিক কৈশোরে ছেলেরা ছুটোছুটি খেলা, চাতুর্যপুর্ণ খেলা, পেশী সংক্রান্ত খেলা—এইসবই ভালোবাসে বেশী। মেয়েরা এসব পছন্দ করলেও তাদের আগ্রহ ছেলেদের মতন অত প্রবল থাকে না। যেসব খেলায় প্রতিযোগিতা বর্তমান বা বেশী নিয়ম-কানুন সেসব খেলা মেয়েরা তেমন পছন্দ করে না। সাধারণতঃ ৮।১০ বছর বয়সে, মেয়েরা মেয়েদের সাথে আর ছেলেরা ছেলেদের সাথেই খেলতে ভালোবাসে বেশী। পূর্ণকৈশোর ও কৈশোরোত্তর কালে যেসব খেলা বা কাজ একসঙ্গে মিলেমিশে করা যায়, সেই সব কাজের দিকে ছেলেমেয়েদের ঝোঁক বেশী দেখা যায়।

## দৌড়-ঝাঁপ ও সংঘবদ্ধ খেলা

দৌড়-ঝাঁপ, ফুটবল, বক্সিং, হাডুডু ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কিশোর মনের আক্রমনাত্মক ভাবটি অবাধ মুক্তি লাভ করে। কিশোরদের মধ্যে এই জাতীয় খেলাধুলো যে কত প্রিয়, তা স্পোর্টস, ক্লাব, কিশোর-সংগঠনগুলির জনপ্রিয়তা দেখে অনুমান করা যায়। এর কারণ অনুসন্ধান ক'রে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এই দৌড়-ঝাঁপ খেলার মধ্যে নিজের কলা-কৌশল দেখিয়ে কিশোর মন তৃপ্তি পায়। সুদক্ষ দৌড়বাজতো শুধু নিজে তৃপ্ত হয় না, পুরস্কার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সে একটা সামাজিক অনুমোদনও পায়। খেলার মাঝে দৈনন্দিন বাঁধাধরার জীবন থেকে যে-মুক্তি পাওয়া যায়, ও চলা ফেরায় যে বেশী স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তাও আর একটা কারণ বটে। তা ছাড়া, যখন কাজ বা খেলার পিছনে ব্যক্তিগত ও দলগত সাফল্যের প্রেরণা দুই কাজ করে, তখনই কিশোররা সবচেয়ে ভালো কাজ ক'রে থাকে। দলের প্রতি এই সময় আনুগত্য খুব বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে। অন্য দলের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব এই সময় কিশোরদের মাঝে দেখা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

কিশোর-পরিচালকদের লক্ষ্য রাখা উচিত, কৈশোরের প্রথম দিকটাতেই (৯-১২) ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়-ঝাঁপ খেলা বেশী পছন্দ করে। কারণ, এই সময় তারা সামাজিক চাপ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে এবং খেলার মাঝেই এর থেকে সাময়িক মুক্তি খুঁজে পায়।

আর একটু বড় হ'লে, বেশীর ভাগ কিশোরই খেলাধুলো ছাড়া—ভ্রমণ, ক্যাম্প-জীবন, সাইকেলে দূরদেশে যাওয়া, বাগানের কাজ, খেত-খামারের কাজ এই সব করতে খুব ভালোবাসে। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়, দৈনন্দিন বাঁধা ধরা থেকে মন মুক্তি পায়, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়—এই সবের জন্য এর ওপর একটা বড় আকর্ষণ রয়ে যায়।

এই বয়সে কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের আবার হাতের-কাজেও অনুরক্ত হ'তে দেখা যায়। তবে সবদিক বিচার ক'রে মনে হয়, যে-কাজে দেহ-মন দুইয়েরই যোগাযোগ ঘটে, সেই কাজে বা খেলাতেই কিশোর মন আকৃষ্ট হয় বেশী।

সাহিত্য-সভা, বিতর্কসভা, নাটকাদি অভিনয় এ সবের প্রতিও কিশোর মন এইসময় খুব আকৃষ্ট হয়। কিশোর-প্রতিষ্ঠানগুলির তাই উচিত, কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ এই সব সুযোগ সুবিধা ক'রে দেওয়া।

## বইপড়া

বই পড়া বলতে, আমরা এখানে অবসর সময়ে বাইরের বই পড়ে আনন্দ পাওয়ার কথাই বলবো, স্কুল-পাঠ্য বিষয়ের কথা নয়।

বই পড়ার ঝোঁকটা প্রথম-কৈশোরের দিকে থাকে বেশী এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে থাকে। পরবর্তী কৈশোরে পড়াশুনা ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজের চাপে বাইরের বই পড়ার ঝোঁকটা কিছু কমে আসে। ১২।১৩ বছর বয়সেই সাধারণতঃ পড়ার ইচ্ছা খুব বেশী দেখা দেয়। ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই কিশোরদের পড়ার অভ্যাস, বিশেষ-বিশেষ বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রাথমিক কৈশোরে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় গল্প উপন্যাস পছন্দ করে বেশী। শুধু মেয়েদের জন্য লেখা বই ছেলেরা তেমন পছন্দ ক'রে না; মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের জন্য লেখা বইও পছন্দ করে। প্রাথমিক কৈশোরে ছেলেরা ভ্রমণ, এ্যাড্ভেন্চার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ভালোবাসে। স্কুলের বা হোষ্টেলের জীবন সংক্রান্ত বই, দুষ্টুমির গল্প, এসবও তারা বেশ পছন্দ করে। হাসির গল্প ১৪।১৫ বছরের সব ছেলে-মেয়েরই খুব প্রিয়। যে-সব ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ উচ্চস্তরের তারা অন্যের তুলনায় পড়ে বেশী।

## কৈশোরে বন্ধু-জীবনের গুরুত্ব

বন্ধুর প্রয়োজন এই বয়সে যত বোধ করা যায়, তেমন আর

কোন বয়সেই হয় না। শৈশবে বাবা, মা, ভাই, বোন বা বাড়ীর যে কেউই শিশুর কাছে অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। বয়স্ক মানুষ তার পরিবার, কর্মজীবন বা অন্যান্য কাজ কর্ম নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকে যে, তার কাছে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বতার তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কৈশোরে এই অন্তরঙ্গতার প্রয়োজন বোধ করা যায় প্রবলভাবে। এই সময় কিশোর মন তারই সমবয়সী এমন বন্ধু চায়, যার কাছে সে নিজের মনের কথা এবং যেসব ব্যাপার তার মনে গভীরভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করে—সেই সব বিষয়, গোপনীয় যত কিছু সব বিশ্বাস ক'রে ব'লে যেতে চায়। আর প্রতিদানে সেও তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে, তাকে বোঝবার চেষ্টা করুক—এই রকম প্রাণের বন্ধুই এই সময় কিশোরের কাম্য হ'য়ে ওঠে। কারণ তার মনে হয়, বড়রা তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। কাজেই এই বয়সে বিশেষ কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাব দেখলে, সেটাকে কিশোর মনের সুস্থ বিকাশের একটা স্তর ব'লেই গণ্য করা দরকার। যে-শিশু শৈশবে বা কৈশোরে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পায় না, তার সামাজিক সুস্থ বিকাশ হওয়াও কঠিন হ'য়ে পড়ে।

কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের যেমন বন্ধুজীবন সম্বন্ধে উৎসাহিত করা উচিত, তেমনি আবার এটাও দেখা দরকার, যে কোনো একটি বিশেষ বন্ধুর প্রতি অবিচ্ছেদ্য ভাব বা অতি হৃদ্যতা না গ'ড়ে ওঠে। কারণ, এতে কিশোরের সুস্থ সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়। যেখানে এই ভাবটি বর্তমান সেক্ষেত্রে শিশুকে পীড়ন না ক'রে, তার মন যাতে খুশি হয়, নতুন নতুন বিষয় ও বন্ধুদের প্রতি যাতে আকৃষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

## *কিশোর-কিশোরীর বন্ধুত্ব*

কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মেলামেশা বা বন্ধুভাব আমাদের সমাজে খুব প্রীতির চোখে দেখা হয় না। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে,

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অস্বাভাবিক দেয়াল তুলে রাখলে, কৈশোরের স্বাভাবিক ভাবাবেগ সহজ পথে স্ফুরণের সুযোগ পায় না, ফলে দেখা দেয় নোংরামি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সহজ মেলামেশা ও আদান প্রদানের সুযোগ থাকলে, কিশোর-কিশোরীর ভবিষ্যৎ সামাজিক ও কর্ম জীবন পুর্ণ বিকাশের পথে অনেকখানি যায় এগিয়ে। তাছাড়া আজকের দিনে নর-নারীর সবাইকেই যখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হচ্ছে, তখন গোড়া থেকেই তারা যাতে অহেতুক কৌতূহল ও মোহ মুক্ত হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কৈশোরে ছেলেমেয়েদের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে মেলামেশার সুযোগ দিলে, খেলা-ধুলা, হুড়োহুড়ির মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের দোষ-গুণ, সাম্য-বৈসাম্য, কৌতূহল-আগ্রহ সব জানতে পারে। সব জেনেশুনে, কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি জাগে সেই সম্ভ্রমপুর্ণ বন্ধু ভাব—যার মর্যাদাকে তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে শেখে।

সময়-সময়, কিশোর-কিশোরীর এই বন্ধুত্বের মধ্যে একটা সাময়িক রোমাঞ্চকর ভাব গ'ড়ে ওঠা আশ্চর্য নয়—তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এতে শঙ্কিত হবার কারণ নেই—সমাজিক ও ভাবাবেগবিকাশের দিক থেকে এও একটি শিক্ষার দিক।

ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কথা বলতে গিয়ে ডাঃ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ মশায় 'আমাদের শিক্ষায়' যা বলেছেন, তা সত্যি ভেবে দেখবার মতো। তিনি বলেন, "বাঙ্গালীর অপবাদ আছে যে সে ভাব-প্রবণ, তার যৌন ভাব-প্রবণতা সারাতে হ'লে ছোট বয়স থেকেই নিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও কর্মস্রোতের ভেতরে স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। ব্যবধানের দেয়ালের আড়ালে অস্বাস্থ্যকর চিন্তার আগার গ'ড়ে উঠলে ভবিষ্যজীবনে যৌন অভিযোজন ও সুখের আশা খুবই সুদুর পরাহত।"

## যৌনশিক্ষা

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, নরনারীর জীবনে যৌনজ্ঞানের বিকাশ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিকাশের মতই একটা স্তর বিশেষ এবং অনেক সময়ই তা কৈশোর জীবনের একটি সমস্যাও বটে। এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়তো করা যেতে পারে, যদি আমরা বাড়ীতে বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতই যৌন-শিক্ষা দিতে ইতস্তত না করি। এক্ষেত্রে সহায়কামী, ভীরু কিশোর মনের পক্ষে প্রয়োজন, মানসিক সাম্য রক্ষান্তর তার আত্মরতি হেতু দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে বয়স্কব্যক্তি মাত্রেই এ কাজের উপযোগী নন। বাড়ীতে যে-বয়স্ক ব্যক্তিকে ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শ্রদ্ধা করে এবং যার ওপর তাদের বিশ্বাস ও বন্ধুভাব আছে, তিনিই এ বিষয়ে সংগ্রামী কিশোর মনকে সাহায্য করতে পারেন। এ কাজ যথার্থ তখনই সম্ভব হ'য়ে ওঠে, যখন কিশোর মনও বুঝতে পারে যে, সে এমন একজনের সঙ্গে আলোচনা করছে, যে প্রকৃত কিশোর-সমস্যা কি, তা বুঝতে পারেন এবং যিনি তার সামনে প্রাত্যহিক জীবনাদর্শ তুলে ধরতে পারেন।

সাধারণভাবে আমাদের প্রয়োজন, নর-নারীর মিলনের মধ্যে যে পবিত্র বন্ধন, যে সামাজিক স্থিতি ও নিরাপত্তা বর্তমান তারই আদর্শের ছবি কিশোর মনে তুলে ধরা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে, কিশোর-কিশোরীর পরস্পর সুস্থ ও সহজ মেলামেশার মাধ্যমে প্রচুর কর্মময়, আনন্দময় ও উদ্দীপনাময় সামাজিক জীবন যাপনের সুযোগের ব্যবস্থা করা। অবাঞ্ছিত ও বিকৃত মিশ্রজীবনের বিরুদ্ধে এই প্রকৃত রক্ষা-কবচ ব'লে মনে হয়।

## কিশোর-জীবনের প্রতি সমাজের দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে কিশোর—তথা তরুণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আর নিরুৎসাহজনক মন্তব্য করা খুব একটা সাধারণ ব্যাপারে

পরিগণিত হয়েছে। অবশ্য এর পিছনে তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায়ের কিছু পরিমাণ অবাঞ্ছিত ব্যবহার বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সে-জন্য তাদের সর্বাগ্রে দোষী ও দায়ী না ক'রে, বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিতে আমাদের চিন্তা ক'রে দেখা দরকার যে, তাদের মাঝে কেন এই অবাঞ্ছিত ও বিদ্রোহসূচক ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। সামাজিক দিক দিয়ে আমরাই বা তার প্রতিকার সাধন করতে পারছি না কেন?

বিশ্লেষণ করলে, এর পিছনে অনেক কারণ বর্তমান দেখা যাবে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে ন্যায়-নীতির আদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং আমরা, অভিভাবক-স্থানীয় লোকেরাও সেই আদর্শের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা ক'রে কিশোরদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছি না; ফলে সমাজের মধ্যে একটা আদর্শ পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি হচ্ছে না। তা ছাড়া, কিশোর মনে বয়সানুযায়ী যে আকাঙ্ক্ষা জাগছে, তা মেটাবার সুযোগও আমরা দিচ্ছি না। তার কর্মপ্রেরণা, বা স্বাধীনতাস্পৃহা, নতুনকে জানবার ইচ্ছা ইত্যাদি সংক্রান্ত যে-উৎসাহ কৈশোরে দেখা দেয়, তাকে যথাযথ পথে চালিতও করতে চাই না বা এ সম্বন্ধে আমরা মাথাও ঘামাই না। যখনই তাদের বিকাশোন্মুখ মনের এই সকল ইচ্ছাগুলি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয়, তখনই আমরা অতি কঠোর হস্তে শাসন করতে বসি, কিন্তু স্থায়ী প্রতিকার কিসে সম্ভব, তার কথা ভাবি না। আজকের দিনে কিন্তু সমাজ-সেবী মাত্রেরই এ সম্বন্ধে ভেবে দেখা উচিত কেন এমনটি হয়? মিলিটারীর মতন শাসন-শৃঙ্খলা আরোপ ক'রে, সাময়িক ফল হয়তো পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এর ফলে শাস্তিদাতা, কিশোরের মনে কোন স্থায়ী আসন লাভ করতে তো পারেনই না, অপরাধীরও নৈতিক উন্নতি তেমন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। উপরন্তু বাইরে বাধা পাওয়ার দরুণ গোপনে গোপনে সে হয়তো আরও আপত্তিকর কাজে রত হ'য়ে পড়ে এবং সুযোগ পেলেই স্বরূপ ধারণ করে।

আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে গেলে, প্রথমেই ধরতে হয় পরিবারের কথা, কারণ, বিভিন্ন পরিবার একত্রীভূত হ'য়েই সমাজ গ'ড়ে ওঠে। আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, সমাজে প্রকাশ্যভাবে যে অশান্তিকর কৈশোর-সমস্যা আমরা দেখতে পাই, তা' সুরু হয় অনেক আগেই বাড়ীতে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হ'লো ছেলে-মেয়েদের সামাজিক বোধ যাতে যথাযথ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা ও তার মানসিক প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা। পরিবারের স্নেহ-প্রীতি যে তার ওপর যথাযথ বর্তমান, এই বোধ কিশোর মনে জাগ্রত করা।

সমাজের পক্ষ থেকে, সমষ্টিগতভাবে কিশোরদের জন্য আমাদের ব্যবস্থা করার দরকার—শৃঙ্খলাযুক্ত, প্রাণ-প্রাচুর্যপূর্ণ কিশোর সংগঠনের, পূর্ণাঙ্গ পাঠাগারের, জনহিতকর সামাজিক কাজে আত্ম-নিয়োগের সুযোগ, শিল্প, সংগীত, অভিনয় ও খেলাধূলার ব্যবস্থা, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ, সৈনিক, নাগরিক ও বৈমানিক জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের সুযোগ এবং কিশোর-কিশোরীর মিলিত ভাবে কাজ করার সুযোগ এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের পরিচালনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের। এই সঙ্গে এটাও নজর রাখা দরকার যে, পরবর্তী কালে, তাদের কর্মজীবন ও শিক্ষা পরিসমাপ্তি কালের মধ্যে ব্যবধান যেন অযথা দীর্ঘ না হ'য়ে ওঠে।

## কিশোর ও বিদ্যালয়

এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের দিক থেকে দরকার, বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল দীর্ঘকরা, ( ১৫ থেকে ১৬ বছর ) বৃত্তি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নীতি ও ধর্ম-জিজ্ঞাসামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা, বিদ্যালয়-জীবন অর্থপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলার ব্যবস্থা, ছাত্রদের কাজের সপ্রশংস অনুমোদন, অবসর সময়কে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কিশোর জীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

## উপসংহার

কৈশোরের সম্পূর্ণ দিকগুলি এই সামান্য পুস্তিকায় আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবুও আমরা কিশোর পরিচালনার বিশেষ সমস্যাগুলির কথা স্মরণ ক'রে, তারই ওপর কিছুটা আলোক পাতের চেষ্টা করেছি মাত্র। কৈশোর—জীবনের একটি মধুর আনন্দপূর্ণ অথচ সঙ্কটময় বিকাশ। বয়স্ক মানুষের যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করার আগে, কঠিন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমাদের সকলকেই এগিয়ে। যারা এই শিক্ষায় নিজেকে ভেঙ্গে-গ'ড়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে মানুষ ক'রে তোলে, তারাই হয়তো লাভ ক'রে থাকে আংশিক পূর্ণতা। অনেকে আবার তা পারে না এতটুকুও। চিরকাল অন্তরে অন্তরে এরা রয়ে যায় শিশুই। আমাদের তাই উচিত কিশোরকে সেই শিক্ষাই দেওয়া, যাতে সে দেশের পক্ষে সুস্থ, প্রয়োজনীয় নাগরিক হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে। আজকের দিনে পরীক্ষায় পাশ করার ওপরই জীবনের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে—এই ধারণা আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে বসে আছে। কিন্তু কবে আমরা এই উপলব্ধি করতে পারবো যে, ছাপমারা কাগজের অধিকারী হওয়ার মানে এই নয় যে, ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক ও নৈতিক বোধ পূর্ণতা লাভ করেছে এতেই। কোনও কিশোর হয়তো বিদ্যালয়ের আদর্শে পরীক্ষায় অনেক বেশী নম্বর পেয়ে আদর্শ ছেলে ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনে হয়তো তাকে দেখা যেতে পারে আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর, হৃদয়হীন অসামাজিক ব্যক্তি হিসাবে। সংসার-পরীক্ষায় সেই—পাশেরই দাম বেশী, যার প্রশংসা-পত্র আমাদের সত্যকারের মানুষের পথে নিয়ে চলে এগিয়ে। শুধু পাশের দ্বারা ভাল ছেলে হওয়া যায়—সত্যিকারের বড় হওয়া যায় না। এই সত্যিকারের বড় হওয়ার যাত্রা-পথে, বিকাশোন্মুখ কিশোর হৃদয়গুলি আপনার কাছে কামনা করে সুস্থ-ঔদার্য, ক্ষমা-সুন্দর কারুণ্য, প্রাণ-প্রাচুর্যময় সহানুভূতি আর প্রজ্ঞানময় নির্দেশ।

---

## গ্রন্থ-পঞ্জী

( 'কিশোর ও কৈশোর' প্রসঙ্গে আলোচিত
পুস্তক-পুস্তিকাবলী )


১। The adventure of youth
—Dr. Olive. A. Wheeler.

২। Adolescence
—Dr. G. S. Hall.

৩। The Psychology of the Adolescent
—Dr. Leta Hollingworth.

৪। Principles of Adolescent Psychology
—E. S. Conklin.

৫। Adolescence its social Psychology
—C. M. Flemings.

৬। Child Psychology
—C. Skinner & P. L. Harriman

৭। Guiding the Adolescent
—U. S. Children's Bureau.

৮। Youth need's understanding parents
—Iowa State College.

৯। Early childhood to Adolescence.
—Dr. Agatha Bowley.

১০। আমাদের শিক্ষা
—ডক্টর ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ।

১১। The Young Delinquent
—Dr. Cyril Burt.

* প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী—১৯৫২

* দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে—১৯৫৪

* সম্পাদক
নির্মল চৌধুরী

* প্রকাশক
সলিল পাল
'কিশোর কল্যাণ কেন্দ্রের পক্ষে
১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন
হাওড়া

* শিল্পী
রামকৃষ্ণ দত্ত
অরবিন্দ রায়

* মুদ্রক
শ্রীঅশোক কুমার মল্লিক
শ্রীদুর্গা প্রেস
২।৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
হাওড়া

* প্রাপ্তিস্থান
অশোক লাইব্রেরী
১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা—১২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা ● শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

## প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

১। শিশু ও শৈশব ( দ্বিতীয় মুদ্রণ )

২। শিশু পালনে কোন্‌টী চাই—
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক ( দ্বিতীয় মুদ্রণ )

৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায়
পিছিয়ে পড়ে ? ( দ্বিতীয় মুদ্রণ )

৪। কিশোর ও কৈশোর ( দ্বিতীয় মুদ্রণ )

৫। শিশু অপরাধ ও অপরাধী

৬। শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন

৭। অবোধ্য শিশু

শিশু-লালনী



গ্র ন্থ মা লা

প্রতিটির দাম
চার আনা মাত্র